লীলাবতীর মৃত্যু

হুমায়ূন আহমেদ

সপ্তম শতকের বিখ্যাত ভারতীয় গণিতজ্ঞ শংকরাচার্যের একমাত্র কন্যার নাম লীলাবতী। মেয়েটির কপালে বৈধব্যযোগ আছে, এই অজুহাতে কন্যা-সম্প্রদানের আগে আগে বরপক্ষ মেয়েটির বিয়ে ভেঙে দেয়। লীলাবতী যখন গভীর দুঃখে কাঁদছিল তখন শংকরাচার্য বললেন, 'মাগো, তোমার জন্যে কিছু করার সামর্থ্য আমার নেই, তবে পৃথিবীর মানুষ যেন বহু যুগ তোমাকে মনে রাখে আমি সেই ব্যবস্থা করে যাব।' তিনি গণিতের একটা বই লেখেন। বইটির নাম দেন কন্যার নামে–'লীলাবতী'।

গল্পটি আমাকে এতই অভিভূত করে যে, একরাতে লীলাবতীকে আমি স্বপ্নেও দেখি। গোলগাল মুখ। দীর্ঘ পল্লবের বড় বড় চোখ। দৃষ্টিতে অভিমান। মাথাভর্তি লম্বা কোঁকড়ানো চুল। গায়ের বর্ণ শঙ্খের মতো সাদা।

–হুমায়ূন আহমেদ

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

কিংবদন্তি কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে 'নন্দিত নরকে'র মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ। এই উপন্যাসে নিম্নমধ্যবিত্ত এক পরিবারের যাপিত জীবনের আনন্দ-বেদনা, স্বপ্ন, মর্মান্তিক ট্রাজেডি মূর্ত হয়ে উঠেছে। নগরজীবনের পটভূমিতেই তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস রচিত। তবে গ্রামীণ জীবনের চিত্রও গভীর মমতায় তুলে ধরেছেন এই কথাশিল্পী। এর উজ্জ্বল উদাহরণ 'অচিনপুর', 'ফেরা', 'মধ্যাহ্ন'। মুক্তিযুদ্ধ বারবার তাঁর লেখায় ফুঠে উঠেছে। এই কথার উজ্জ্বল স্বাক্ষর 'জোছনা ও জননীর গল্প', '১৯৭১', 'আগুনের পরশমণি', 'শ্যামল ছায়া', 'নির্বাসন' প্রভৃতি উপন্যাস। 'গৌরীপুর জংশন', 'যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ', 'চাঁদের আলোয় কয়েকজন যুবক'-এ জীবন ও চারপাশকে দেখার ভিন্ন দৃষ্টিকোণ মূর্ত হয়ে উঠেছে। 'বাদশা নামদার' ও 'মাতাল হাওয়া'য় অতীত ও নিকট-অতীতের রাজরাজড়া ও সাধারণ মানুষের গল্প ইতিহাস থেকে উঠে এসেছে।

গল্পকার হিসেবেও হুমায়ূন আহমেদ ভিন্ন দ্যুতিতে উদ্ভাসিত। ভ্রমণকাহিনি, রূপকথা, শিশুতোষ, কল্পবিজ্ঞান, আত্মজৈবনিক, কলামসহ সাহিত্যের বহু শাখায় তাঁর বিচরণ ও সিদ্ধি।

হুমায়ূন আহমেদের জন্ম ১৩ নভেম্বর ১৯৪৮ এবং প্রয়াণ ১৯ জুলাই ২০১২।

আলোকচিত্র : মাজহারুল ইসলাম

লীলাবতীর মৃত্যু

হুমায়ূন আহমেদ

অন্যপ্রকাশ

গ্রন্থস্বত্ব © লেখক

প্রথম প্রকাশ একুশের বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ২০১৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ একুশের বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ২০১৪

লেখক এবং প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে এই বইয়ের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। কোনো যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক্স, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যম, যেমন ফটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনো পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না। বা কোনো ডিস্ক, টেপ, পারফোরেট মিডিয়া বা কোনো তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

প্রকাশক : মাজহারুল ইসলাম, অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১২৫৮০২
প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
মুদ্রণ : কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা
মূল্য ২০০ টাকা [১০ মার্কিন ডলার]

Lilabotir Mrityau
by Humayun Ahmed

Published in Bangladesh
by Mazharul Islam, Anyaprokash
e-mail : anyaprokash38@gmail.com
web : www.e-anyaprokash.com

ISBN : 978 984 502 184 5

প্রসঙ্গ কথা

'নবিজী' এবং আরও আঠারোটি লেখার সংকলন এই গ্রন্থ।

'নবিজী' লেখাটির পেছনে একটা গল্প আছে। বাংলাবাজারে *অন্যপ্রকাশ*-এর নতুন বিক্রয়কেন্দ্র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এক মাওলানা হুমায়ূন আহমেদকে বললেন, 'আপনার লেখা স্যার এত লোক আগ্রহ নিয়ে পড়ে, আপনি যদি আমাদের নবি-করিমের জীবনীটা লিখতেন, তাহলে বহু লোক লেখাটি আগ্রহ করে পাঠ করত। আপনি খুব সুন্দর করে তাঁর জীবনী লিখতে পারতেন।' মাওলানা সাহেবের কথায় তাঁর ভেতরে একটা ঘোর তৈরি হলো। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন নবিজীর জীবনী লিখবেন। দৈনিক *কালের কণ্ঠে*র সাময়িকী 'শিলালিপি'তে (২১ অক্টোবর, ২০১১) প্রকাশিত তাঁর সাক্ষাৎকারে হুমায়ূন আহমেদ নিজেই একথা জানিয়েছেন।

'নবিজী' লেখাটি শুরু করেছিলেন তিনি। পুরোটা লিখে যেতে পারেন নি। লেখাটি এই প্রথম গ্রন্থভুক্ত হলো।

'লীলাবতীর মৃত্যু' লেখাটি আমাদের যৌথজীবনের এক বিয়োগান্ত অধ্যায় নিয়ে লেখা। হুমায়ূন আহমেদ লিখেছেন, 'নিতান্তই ব্যক্তিগত কাহিনি লিখে ফেললাম। লেখকদের কাজই তো ব্যক্তিগত দুঃখবোধ ছড়িয়ে দেওয়া।'

লেখা দু'টি তাঁর প্রয়াণের পর প্রথম প্রকাশিত হয়।

অন্য লেখাগুলোতে একটা অচিন রাগিণী হৃদয়কে আর্দ্র করে দেয়। নশ্বর এই জগতসংসার আর মানবজীবনের নানা অপূর্ণতা ও জরা-ব্যাধি-মৃত্যুবিষয়ক ভাবনা ছুঁয়ে যায় পাঠক-মন।

মেহের আফরোজ শাওন
'দখিন হাওয়া'
ধানমণ্ডি, ঢাকা

সূচি

নবিজী ৯
লীলাবতীর মৃত্যু ১৬
অমরত্ব ২৪
প্রসঙ্গ : আত্মা ২৮
মহেশের মহাযাত্রা ৩১
হাসপাতাল ৩৪
চ্যালেঞ্জার ৪১
মানব এবং দানব ৪৬
উন্মাদ-কথা ৪৮
অসুখ ৫২
সে ৫৫
নারিকেল-মামা ৬১
আমার বন্ধু সফিক ৬৫
শিকড় ৭১
তিনি ৭৪
একদিন চলিয়া যাব ৭৮
মৃত্যু ৮১
আমার বাবার জুতা ৮৬
হোটেল আহমেদিয়া ৯০

নবিজী

তখন মধ্যাহ্ন।

আকাশে গনগনে সূর্য। পায়ের নিচের বালি তেতে আছে। ঘাসের তৈরি ভারী স্যান্ডেল ভেদ করে উত্তাপ পায়ে লাগছে। তাঁবুর ভেতর থেকে বের হওয়ার জন্যে সময়টা ভালো না। আউজ তাঁবু থেকে বের হয়েছে। তাকে অস্থির লাগছে। তার ডান হাতে চারটা খেজুর। সে খেজুর হাতবদল করছে। কখনো ডান হাতে কখনো বাম হাতে।

আউজ মনের অস্থিরতা কমানোর জন্যে দেবতা হাবলকে স্মরণ করল। হাবল কা'বা শরিফে রাখা এক দেবতা—যার চেহারা মানুষের মতো। একটা হাত ভেঙে গিয়েছিল বলে কা'বা ঘরের রক্ষক কোরেশরা সেই হাত সোনা দিয়ে বানিয়ে দিয়েছে। দেবতা হাবলের কথা মনে হলেই সোনার তৈরি হাত চোখে চকমক করে।

দেবতা হাবলকে স্মরণ করায় তার লাভ হলো। মনের অস্থিরতা কিছুটা কমল। সে ডাকল, শামা শামা। তাঁবুর ভেতর থেকে শামা বের হয়ে এল। শামা আউজের একমাত্র কন্যা। বয়স ছয়। তার মুখ গোলাকার। চুল তামাটে। মেয়েটি তার বাবাকে অসম্ভব পছন্দ করে। বাবা একবার তার নাম ধরে ডাকলেই সে ঝাঁপ দিয়ে এসে তার বাবার গায়ে পড়বে। শামার মা অনেক বকাঝকা করেও মেয়ের এই অভ্যাস দূর করতে পারেন নি।

আজও নিয়মের ব্যতিক্রম হলো না। শামা এসে ঝাঁপ দিয়ে বাবার গায়ে পড়ল। সে হাঁটতে পারছে না। তার বাঁ পায়ে খেজুরের কাঁটা ফুটেছে। পা ফুলে আছে। রাতে সামান্য জ্বরও এসেছে।

শামা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বাবার কাছে আসতেই তার বাবা এক হাত বাড়িয়ে তাকে ধরল। এক হাতে বিচিত্র ভঙ্গিতে শূন্যে ঝুলিয়ে তাকে কোলে তুলে নিল। শামা খিলখিল করে হাসছে। তার বাবা যেভাবে তাকে কোলে তোলেন অন্য কোনো বাবা তা পারেন না।

আউজ বলল, মা, খেজুর খাও।

শামা একটা খেজুর মুখে নিল। সাধারণ খেজুর এটা না। যেমন মিষ্টি স্বাদ তেমনই গন্ধ। এই খেজুরের নাম মরিয়ম।

আউজ মেয়েকে ঘাড়ে তুলে নিয়েছে। রওনা হয়েছে উত্তর দিকে। শামার খুব মজা লাগছে। কাজকর্ম না থাকলে বাবা তাকে ঘাড়ে নিয়ে বেড়াতে বের হন। তবে এমন কড়া রোদে কখনো না। আউজ বলল, রোদে কষ্ট হচ্ছেরে মা ?

শামা বলল, না।

তার কষ্ট হচ্ছিল। সে না বলল শুধু বাবাকে খুশি করার জন্যে।

বাবা!

হুঁ।

আমরা কোথায় যাচ্ছি ?

তোমাকে অদ্ভুত একটা জিনিস দেখাব।

সেটা কী ?

আগে বললে তো মজা থাকবে না।

তাও ঠিক। বাবা, অদ্ভুত জিনিসটা শুধু আমি একা দেখব ? আমার মা দেখবে না ?

বড়রা এই জিনিস দেখে মজা পায় না।

আউজ মেয়েকে ঘাড় থেকে নামাল। সে সামান্য ক্লান্ত। তার কাছে আজ

শামাকে অন্যদিনের চেয়েও ভারী লাগছে। পিতা এবং কন্যা একটা গর্তের পাশে এসে দাঁড়াল। কুয়ার মতো গর্ত, তবে তত গভীর না।

আউজ বলল, অদ্ভুত জিনিসটা এই গর্তের ভেতরে আছে। দেখো ভালো করে। শামা আগ্রহ এবং উত্তেজিত হয়ে দেখছে। আউজ মেয়ের পিঠে হাত রাখল। তার ইচ্ছা করছে না মেয়েটাকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলতে। কিন্তু তাকে ফেলতে হবে। তাদের গোত্র বনি হাকসা আরবের অতি উচ্চ গোত্রের একটি। এই গোত্র মেয়েশিশু রাখে না। তাদের গোত্রের মেয়েদের অন্য গোত্রের পুরুষ বিবাহ করবে ? এত অসম্মান ?

ছোট্ট শামা বলল, বাবা, কিছু তো দেখি না।

আউজ চোখ বন্ধ করে দেবতা হাবলের কাছে মানসিক শক্তির প্রার্থনা করে শামার পিঠে ধাক্কা দিল।

মেয়েটা 'বাবা' 'বাবা' করে চিৎকার করছে। তার চিৎকারের শব্দ মাথার ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। আউজকে দ্রুত কাজ সারতে হবে। গর্তে বালি ফেলতে হবে। দেরি করা যাবে না। একমুহূর্ত দেরি করা যাবে না।

শামা ছোট্ট হাত বাড়িয়ে ভীত গলায় বলছে, বাবা, ভয় পাচ্ছি। আমি ভয় পাচ্ছি।

আউজ পা দিয়ে বালির একটা স্তূপ ফেলল। শামা আতঙ্কিত গলায় ডাকল, মা! মা গো!

তখন আউজ মেয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, উঠে আসো।

আউজ মাথা নিচু করে তাঁবুর দিকে ফিরে চলেছে। তার মাথায় পা ঝুলিয়ে আতঙ্কিত মুখ করে ছোট্ট শামা বসে আছে। আউজ জানে সে মস্ত বড় ভুল করেছে। গোত্রের নিয়ম ভঙ্গ করেছে। তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। তাকে অবশ্যই গোত্র থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। এই অকরুণ মরুভূমিতে সে শুধুমাত্র তার স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে বাঁচতে পারবে না। জীবনসংগ্রামে টিকে থাকতে হলে তাকে গোত্রের সাহায্য নিতেই হবে। গোত্র টিকে থাকলে সে টিকবে।

বেঁচে থাকার সংগ্রামের জন্যে গোত্রকে সাহায্য করতেই হবে। গোত্র বড় করতে হবে। পুরুষশিশুরা গোত্রকে বড় করবে। একসময় যুদ্ধ করবে। মেয়েশিশুরা কিছুই করবে না। গোত্রের জন্যে অসম্মান নিয়ে আসবে। তাদের নিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ছুটে যাওয়াও কষ্টকর।

আউজ আবার গর্তের দিকে ফিরে যাচ্ছে। ছোট্ট শামা ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না। মরুভূমিতে দিকচিহ্ন বলে কিছু নেই। সবই এক।

আজ থেকে সতেরো শ' বছর আগে আরব পেনিসুয়েলার এটি অতি সাধারণ একটি চিত্র। রুক্ষ কঠিন মরুভূমির অতি সাধারণ নাটকীয়তাবিহীন ঘটনা। যেখানে বেঁচে থাকাই অসম্ভব ব্যাপার সেখানে মৃত্যু অতি তুচ্ছ বিষয়।

আরব পেনিসুয়েলা। বিশাল মরুভূমি। যেন আফ্রিকার সাহারা। পশ্চিমে লোহিত সাগর, উত্তরে ভারত মহাসাগর, পূর্বে পার্শিয়ান গালফ। দক্ষিণে প্যালেস্টাইন এবং সিরিয়ার নগ্ন পর্বতমালা। সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন একটি অঞ্চল। এখানে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা বলে কিছু নেই, সারা বৎসরই মরুর আবহাওয়া। দিনে প্রখর সূর্যের উত্তাপ সব জ্বালিয়ে ছারখার করে দিচ্ছে। সারা দিন ধরে বইছে মরুর শুষ্ক হাওয়া। হাওয়ার সঙ্গে উড়ে আসছে তীক্ষ্ণ বালুকণা। কোথাও সবুজের চিহ্ন নেই। পানি নেই। তারপরেও দক্ষিণের পর্বতমালায় বৃষ্টির কিছু পানি কীভাবে কীভাবে চলে আসে মরুভূমিতে। হঠাৎ খানিকটা অঞ্চল সবুজ হয়ে ওঠে। বালি খুঁড়লে কাদা মেশানো পানি পাওয়া যায়। তৃষ্ণার্ত বেদুইনের দল ছুটে যায় সেখানে। তাদের উটগুলির চোখ চকচক করে ওঠে। তারা হঠাৎ গজিয়ে ওঠা কাঁটাভর্তি গুল্ম চিবায়। তাদের ঠোঁট কেটে রক্ত পড়তে থাকে। তারা নির্বিকার। মরুর জীবন তাদের কাছেও কঠিন। অতি দ্রুত পানি শেষ হয়। কাটাভর্তি গুল্ম

শেষ হয়। বেদুইনের দলকে আবারও পানির সন্ধানে বের হতে হয়। তাদের থেমে থাকার উপায় নেই। সব সময় ছুটতে হবে। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। কোথায় আছে পানি ? কোথায় আছে সামান্য সবুজের রেখা ? ক্লান্ত উটের শ্রেণী তাদেরকে মরুভূমির একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে নিয়ে চলে।

মাঝেই যুদ্ধ। এক গোত্রের সঙ্গে আরেক গোত্রের হামলা। পরিচিত গোত্রের পুরুষদের হত্যা করা। রূপবতী মেয়েদের দখল নিয়ে নেওয়া। রূপবতীরা সম্পদের মতো, তাদের বেচাকেনা করা যায়।

প্রতিটি গোত্র নিজেদের রক্ষা করার চেষ্টাতেই যুদ্ধ চালিয়ে যায়। ব্যবসায়ীরা মালামাল নিয়ে সিরিয়া বা ইয়ামেন থেকে যখন আসা-যাওয়া করে তখন তাদের ওপরও ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। মালামাল লুট করতে হয়। বেঁচে থাকতে হবে। সারভাইবেল ফর দ্য ফিটেস্ট। ভয়ঙ্কর এই মরুভূমিতে যে ফিট সে-ই টিকে থাকবে। তাদের কাছে জীবন মানে বেঁচে থাকার ক্লান্তিহীন যুদ্ধ।

এই ছোটাছুটির মধ্যেই মায়েরা গর্ভবতী হন। সন্তান প্রসব করেন। অপ্রয়োজনীয় কন্যাসন্তানদের গর্ত করে জীবন্ত পুঁতে ফেলা হয়।

পবিত্র কোরানশরিফে সূরা তাকবীরে জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যা-বিষয়ে আয়াত নাজেল হলো। কেয়ামতের বর্ণনা দিতে দিতে পরম করুণাময় বললেন—

> সূর্য যখন তার প্রভা হারাবে, যখন নক্ষত্র খসে পড়বে, পর্বতমালা অপসারিত হবে। যখন পূর্ণগর্ভা উষ্ট্রী উপেক্ষিত হবে, যখন বন্যপশুরা একত্রিত হবে, যখন সমুদ্র স্ফীত হবে, দেহে যখন আত্মা পুনঃসংযোজিত হবে, তখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাস করা হবে—কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল ?

যে মহামানব করুণাময়ের এই বাণী আমাদের কাছে নিয়ে এসেছেন, আমি এক অকৃতী তাঁর জীবনী আপনাদের জন্যে লেখার বাসনা করেছি। সব মানুষের পিতৃঋণ-মাতৃঋণ থাকে। নবিজীর কাছেও আমাদের ঋণ আছে। সেই বিপুল ঋণ শোধের অতি অক্ষম চেষ্টা।

ভুলভ্রান্তি যদি কিছু করে ফেলি তার জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি পরম করুণাময়ের কাছে। তিনি তো ক্ষমা করার জন্যেই আছেন। ক্ষমা প্রার্থনা করছি নবিজীর কাছেও। তাঁর কাছেও আছে ক্ষমার অথৈ সাগর।

'তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে।'

বিখ্যাত এই গানের কলি শুনলেই অতি আনন্দময় একটি ছবি ভেসে ওঠে। মা মুগ্ধ চোখে নবজাত শিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর কোলে পূর্ণিমার স্নিগ্ধ চন্দ্র। তাঁর চোখ-মুখ আনন্দে ঝলমল করছে।

ঘটনা কি সে রকম ?

সে রকম হওয়ার কথা না। শিশুটির বাবা নেই। বাবা আবদুল্লাহ তাঁর সন্তানের মুখ দেখে যেতে পারেন নি। মা আমিনার হৃদয় সেই দুঃখেই কাতর হয়ে থাকার কথা। আরবের শুষ্ক কঠিন ভূমিতে পিতৃহীন একটি ছেলের বড় হয়ে ওঠার কঠিন সময়ের কথা মনে করে তাঁর শঙ্কিত থাকার কথা।

শিশুর জন্মলগ্নে মা আমিনার দুঃখ-কষ্ট যে মানুষটি হঠাৎ দূর করে দিলেন, তিনি ছেলের দাদাজান। আবদুল মোতালেব। তিনি ছেলেকে দু'হাতে তুলে নিলেন। ছুটে গেলেন কা'বা শরিফের দিকে। কা'বার সামনে শিশুটিকে দু'হাতে ওপরে তুলে উচ্চকণ্ঠে বললেন, আমি এই নবজাত শিশুর নাম রাখলাম, মোহাম্মদ!

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। নতুন ধরনের নাম। আরবে এই নাম রাখা হয় না। একজন বলল, এই নাম কেন ? উত্তরে মোতালেব বললেন, মোহাম্মদ শব্দের অর্থ প্রশংসিত। আমি মনের যে বাসনায় নাম রেখেছি তা হলো—একদিন এই শিশু স্বর্গে ও পৃথিবীতে দুই জায়গাতেই প্রশংসিত হবে।

শিশুর জন্ম উপলক্ষে (জন্মের সপ্তম দিনে) দাদা মোতালেব বিশাল ভোজের আয়োজন করলেন। শিশুর চাচারাও আনন্দিত। এক চাচা আবু লাহাব তো আনন্দের আতিশয্যে একজন ক্রীতদাসীকে আজাদ করে দিলেন। ক্রীতদাসীর নাম সুয়াইবা। সে-ই প্রথম আবু লাহাবের কাছে শিশু মোহাম্মদের জন্মের খবর পৌঁছে দিয়েছিল। এই সুয়াইবাই এক সপ্তাহ মোহাম্মদকে তাঁর বুকের দুধ পান করিয়েছিলেন। নবিজী তাঁর দ্বিতীয় ও তৃতীয় কন্যা রুকাইয়া ও কুলসুমকে বিয়ে দিয়েছিলেন আবু লাহাবের দুই পুত্রের সঙ্গে। একজনের নাম উৎবা, অন্যজনের নাম উতাইবা। দুই বোনকে একসঙ্গে না। রুকাইয়াকে প্রথমে। রুকাইয়ার মৃত্যুর পর কুলসুমকে। যদিও পরবর্তী সময়ে আবু লাহাবের নামে পবিত্র কোরানে আয়াত নাজেল হলো—

> ধ্বংস হোক সে। তার ধনসম্পদ ও উপার্জন তার কোনো কাজে আসবে না। সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে। তার স্ত্রীও যে ইন্দন বহন করে। তার গলদেশ খেজুর গাছের আঁশের দৃঢ় রজ্জু নিয়ে। (সূরা লাহাব)

শিশু মোহাম্মদের জন্ম তারিখটা কী ?

যাকেই জিজ্ঞেস করা হোক সে বলবে—৫৭০ খ্রিষ্টাব্দ। বারোই রবিউল আউয়াল। দিনটা ছিল সোমবার। সারা পৃথিবী জুড়ে এই দিনটিই জন্মদিন হিসেবে পালন করা হয়। ঈদে মিলাদুন্নবীতে বাংলাদেশে সরকারি ছুটি পালন করা হয়।

নবিজীর জন্মের সঠিক তারিখ নিয়ে কিন্তু ভালো জটিলতা আছে। ইতিহাসবিদরা মোটামুটি সবাই একমত যে, তাঁর জন্ম হয়েছে হস্তিবর্ষে (Year of the Elephant, 570)। নবিজীর আদি জীবনীকারদের একজন ইবনে আব্বাস বলছেন, তাঁর জন্ম হস্তি দিবসে (Day of the Elephant)। একদল ইতিহাসবিদ বলছেন, মোটেই এরকম না। নবিজী জন্মেছেন এর পনেরো বছর আগে। আবার একদল বলেন, নবিজীর জন্ম হস্তি বছরের অনেক পরে, প্রায় সত্তুর বছর পরে।

জন্ম মাস নিয়েও সমস্যা। বেশির ভাগ ইতিহাসবিদ বলছেন চন্দ্রবৎসরের তৃতীয় মাসে তাঁর জন্ম। তারপরেও একদল বলছেন, তাঁর জন্ম মোহররম মাসে। আরেকদল বলছেন, মোটেই না। তাঁর জন্ম সাফার মাসে।

জন্ম তারিখ নিয়েও সমস্যা। একদল বলছেন রবিউল আউয়ালের ৩ তারিখ, একদল বলছেন ৯ তারিখ, আবার আরেক দল ১২ তারিখ।

এখন বেশির ভাগ মানুষই নবিজীর আদি জীবনীকারের বক্তব্যকে সমর্থন করছেন। বারোই রবিউল আউয়াল সোমবার জন্ম তারিখ ধরা হচ্ছে। তারপরও কথা থেকে যাচ্ছে—বারোই রবিউল আউয়াল কিন্তু সোমবার না। এই হিসাব আধুনিক পঞ্জিকার।

বিতর্ক বিতর্কের মতো থাকুক। একজন মহাপুরুষ জন্মেছেন, যাঁর পেছনে একদিন পৃথিবীর বিরাট এক জনগোষ্ঠি দাঁড়াবে—এটাই মূল কথা।

তখনকার আরবে অভিজাত মহিলারা নিজের শিশু পালন করতেন না। শিশুর জন্যে দুধমা ঠিক করা হতো। দুধমা'রা আসতেন মক্কার বাইরের বেদুইনের ভেতর থেকে।

দুধমা'র প্রচলনের পেছনে প্রধান যুক্তি, আভিজাত্য রক্ষা। দ্বিতীয় যুক্তি, শিশুরা বড় হতো মরুভূমির খোলা প্রান্তরে হেসে-খেলে। এতে তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকত। অর্থনৈতিক বিষয়ও মনে হয় ছিল। সম্পদের বণ্টন হতো। হতদরিদ্র কিছু বেদুইন পরিবার উপকৃত হতো শহরের ধনীশ্রেণীর কাছ থেকে। অতি ভাগ্যবানদের কেউ কেউ মরুভূমির সবচেয়ে দামি উপহার এক-দুইটা উট পেয়ে যেত।

নবিজীর জন্যে দুধমা খোঁজা হতে লাগল। মা আমিনার অর্থনৈতিক অবস্থা তখন শোচনীয়। সম্পদের মধ্যে আছে মাত্র পাঁচটা উট এবং একজন মাত্র ক্রীতদাসী। ক্রীতদাসীর নাম 'বাহিরা'। অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু পরিবারের এতিম ছেলের জন্যে কে আসবে দুধমা হিসেবে!

নবিজীর প্রথম দুধমা'র নাম আইমান। তিনি আবিসিনিয়ার এক খ্রিষ্টান তরুণী। অনেক পরে এই মহিলার বিয়ে হয় যায়েদ বিন হারিসের সঙ্গে। যায়েদ বিন হারিস নবিজীর পালকপুত্র।

আইমানের পরে আসেন থুআইবা। তৃতীয়জন হালিমা। যিনি বানু সাদ গোত্রের রমণী। নবিজীর দুধমা হিসেবে আমরা হালিমাকেই জানি। আগের দু'জনের বিষয়ে তেমন কিছু জানি না।

হালিমার অবস্থাটা দেখি। বানু সাদ গোত্রের সবচেয়ে দরিদ্র মহিলা। ঘরে তার নিজের খাওয়ার ব্যবস্থাই নেই। বুকে দুধ নেই যে নিজের শিশুটিকে দুধ খাওয়াবেন। মক্কায় অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তিনি দত্তক নেওয়ার মতো কোনো শিশু পেলেন না। কে এমন দরিদ্র মহিলার কাছে আদরের সন্তান তুলে দেবে! প্রায় অপারগ হয়েই তিনি শিশু মোহাম্মদকে নিলেন।

পরের ঘটনা নবিজীর জীবনীকার ইবনে ইসহাকের ভাষ্যে শুনি—'যেই মুহূর্তে আমি এই শিশুটিকে বুকে ধরলাম, আমার স্তন হঠাৎ করেই দুধে পূর্ণ হয়ে গেল। সে তৃপ্তি নিয়ে দুধ পান করল। তার দুধভাইও তা-ই করল। দুজনই শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল। আমার স্বামী উঠে গেল মেয়ে উটটাকে দেখতে। কী আশ্চর্য, তার শুকনো ওলানও দুধে পূর্ণ। আমার স্বামী দুধ দুয়ে আনল। আমরা দুজন প্রাণভরে সেই দুধ খেয়ে পরম শান্তিতে রাত্রে ঘুমালাম। পরদিন সকালে আমার স্বামী বলল, হালিমা, তুমি কি বুঝতে পারছ তুমি এক পবিত্র শিশুকে (Blessed one) ঘরে এনেছ?'

শিশু মোহাম্মদের দুধভাইয়ের নাম আবদুল্লাহ। আবদুল্লাহর তিন বোন—শায়মা, আতিয়া ও হুযাফা। বোন শায়মা সবার বড়। শিশু মোহাম্মদকে তার বড়ই পছন্দ। সারা দিনই সে চন্দ্রশিশু কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এখানে-ওখানে চলে যায়। একদিন বিবি হালিমা মেয়ের ওপর খুব বিরক্ত হলেন। মেয়েকে ধমক দিয়ে বললেন, দুধের শিশু কোলে নিয়ে তুমি প্রচণ্ড রোদে রোদে ঘুরে বেড়াও। এটা কেমন কথা! বাচ্চাটার কষ্ট হয় না!

শায়মা তখন একটা অদ্ভুত কথা বলল। সে বলল, মা, আমার এই ভাইটার রোদে মোটেও কষ্ট হয় না। যখনই আমি তাকে নিয়ে ঘুরতে বের হই, তখনই দেখি আমাদের মাথার ওপর মেঘ। মেঘ সূর্যকে ঢেকে রাখে।

নবিজীকে মেঘের ছায়া দানের বিষয়টি জীবনীকার অনেকবার এনেছেন। তাঁর চাচা আবু তালেবের সঙ্গে প্রথম সিরিয়ায় বাণিজ্য-যাত্রাতেও মেঘ তাঁর মাথায় ছায়া দিয়ে রেখেছিল।

লীলাবতীর মৃত্যু

> একটি পুকুরের মধ্যস্থলে একটি জলপদ্ম ফুটিয়াছে। জলপদ্মটি পানির পৃষ্ঠদেশ হইতে এক ফুট উপরে। এমন সময় দমকা বাতাস আসিল, ফুলটি তিন ফুট দূরে সরিয়া জল স্পর্শ করিল। পুকুরের গভীরতা নির্ণয় করো।
>
> (লীলাবতী)

এ ধরনের প্রচুর অঙ্ক আমি আমার শৈশবে পাটিগণিতের বইয়ে দেখেছি। অঙ্কের শেষে 'লীলাবতী' নাম লেখা। ব্যাপারটা কী? লীলাবতী মেয়েটা কে? তার সঙ্গে জটিল এইসব অঙ্কের সম্পর্ক কী?

যা জানলাম তা হচ্ছে—সপ্তম শতকের বিখ্যাত ভারতীয় গণিতজ্ঞ শংকরাচার্যের একমাত্র কন্যার নাম লীলাবতী। মেয়েটির কপালে বৈধব্যযোগ আছে, এই অজুহাতে কন্যা-সম্প্রদানের আগে আগে বরপক্ষ মেয়েটির বিয়ে ভেঙে দেয়। লীলাবতী যখন গভীর দুঃখে কাঁদছিল তখন শংকরাচার্য বললেন, 'মাগো, তোমার জন্যে কিছু করার সামর্থ্য আমার নেই, তবে পৃথিবীর মানুষ যেন বহু যুগ তোমাকে মনে রাখে আমি সেই ব্যবস্থা করে যাব।' তিনি গণিতের একটা বই লেখেন। বইটির নাম দেন কন্যার নামে—'লীলাবতী'।

গল্পটি আমাকে এতই অভিভূত করে যে, একরাতে লীলাবতীকে আমি স্বপ্নেও দেখি। গোলগাল মুখ। দীর্ঘ পল্লবের বড় বড় চোখ। দৃষ্টিতে অভিমান। মাথাভর্তি লম্বা কোঁকড়ানো চুল। গায়ের বর্ণ শঙ্খের মতো সাদা।

খুব ইচ্ছা হলো স্বপ্নের মেয়েটিকে নিয়ে একটা উপন্যাস লেখার। শংকরাচার্যের গণিতের বইয়ের নামের মতো উপন্যাসের নামও হবে 'লীলাবতী'।

উপন্যাস শেষ পর্যন্ত লিখেছি। উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে। কোনো লেখা ছাপা হয়ে বের হওয়ার পর লেখার বিষয়ে আমার কোনো উৎসাহ থাকে না। বইয়ের কাহিনি, পাত্র-পাত্রীদের নাম এবং অনেক সময় বইয়ের নাম পর্যন্ত ভুলে যাই। 'লীলাবতী'র ক্ষেত্রে ভিন্ন ঘটনা ঘটল, নামটা ভুললাম না। প্রায়ই মনে হতো আমার তিনটা পরীর মতো মেয়ে, তাদের কারোর জন্যে এই সুন্দর নামটা মাথায় এল না কেন?

আমি আমার তিন কন্যার নাম হেলাফেলা করে রেখেছি। ভেবেচিন্তে রাখা হয় নি। বড় মেয়েটির নাম নোভা। কার্ল সেগান আমেরিকার টিভিতে 'কসমস' নামে একটি অনুষ্ঠান করতেন। সেখানে নোভা, সুপারনোভা নিয়ে নানান কথা থাকত। নোভা নামটি এসেছে সেখান থেকে। শীলা নামটি নিয়েছি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত গল্প 'শৈলজ শীলা' থেকে। সবচেয়ে ছোট মেয়ে বিপাশার নাম তারাশংকরের 'বিপাশা' নামের উপন্যাস থেকে নেওয়া।

অন্য লেখকদের গল্প-উপন্যাস থেকে নাম নিয়েছি, অথচ নিজের কোনো উপন্যাস থেকে নাম নিলাম না, এটা কেমন কথা ?

এই ভেবে সান্ত্বনা পেলাম যে, লীলাবতী নাম রাখার সুযোগ নষ্ট হয়ে যায় নি। আমার মেয়েদের বিয়ে হবে। ছেলেমেয়ে হবে। তারা নিশ্চয়ই লেখক বাবার কাছে পুত্র-কন্যাদের নামের জন্যে আসবে, তখন একজনের নাম দিয়ে দেব লীলাবতী। ঘটনা সেভাবে ঘটল না। হঠাৎ করেই আমি আমার ছেলেমেয়ের কাছ থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়লাম। কারণ আমি গায়িকা এবং অভিনেত্রী শাওনকে বিয়ে করে ফেলেছি।

কী প্রচণ্ড ঝড়ই না উঠল! পত্রপত্রিকায় কত না কুৎসিত লেখা। যার যা ইচ্ছা লিখছে। যেমন ইচ্ছা গল্প ফাঁদছে। আমার মা-ভাইবোনেরা আমাকে ত্যাগ করল। আত্মীয়স্বজনেরা ত্যাগ করল। একই ঘটনা ঘটল শাওনের ক্ষেত্রেও। সেও বাড়ি থেকে বিতাড়িত। শাওনের বিবাহিত জীবন শুরু হলো চোখের জলে। এই বয়সের মেয়ের বিয়ে নিয়ে কত স্বপ্ন থাকে। হইচই, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, শাড়ি-গয়না, পার্লারের সাজ। তার কপালে কিছুই নেই। সে একা একাই পার্লারে সাজতে গেল। একা একাই নিউ মার্কেটে ঘুরতে লাগল, বিয়ে উপলক্ষে একজোড়া স্যান্ডেল কিনবে।

আমার ভাইবোনেরা সবাই সমাজে প্রতিষ্ঠিত। সমাজে প্রতিষ্ঠিতরা সমাজপতির ভূমিকায় অভিনয় করতে পছন্দ করেন। তারা সবাই সমাজপতি। শাওনকে বিয়ে করার আগে আমি দীর্ঘ চার বছর একা একা কাটিয়েছি। উত্তরায় একটি বাড়ি ভাড়া করে এক বছর থেকেছি, পরে উঠে এসেছি 'দখিন হাওয়া'য়। আমার একা থাকার ব্যবস্থাও সমাজপতিরা মিটিং করে করেছেন। হুমায়ূন দুষ্ট মানুষ। সে পরিবারে থাকবে না। আলাদা থেকে সংশোধিত হবে। যখন হবে তখন ফিরতে পারবে সংসারে।

আলাদা বাস করছি। উত্তরার একটা বিশাল বাড়িতে একা থাকি। রাতে সব ক'টা বাতি জ্বালিয়ে রাখি। চেষ্টা করি রাতে না ঘুমাতে, কারণ ঘুমের মধ্যে আমাকে 'বোবায়' ধরে। এটা একধরনের রোগ। রোগের লক্ষণ—ঘুমের মধ্যে

মনে হবে কেউ বুকের ওপর বসে গলা চেপে ধরে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে। ভয়ঙ্কর কষ্টের ব্যাপার।

মানসিক এই অবস্থায় খবর পেলাম আমার ভাইবোনেরা মা'কে সঙ্গে নিয়ে একটি সংবাদ সম্মেলনের ব্যবস্থা করছে। সেই সংবাদ সম্মেলনে আমার অনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাখ্যা করা হবে। মূল পরিবারের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক নেই তা বলা হবে। এবং সাংবাদিকদের বলা হবে, আমার কোনো বিষয় নিয়ে যেন তাদেরকে এবং আমার ছেলেমেয়ে ও তাদের মা'কে বিরক্ত বা বিব্রত না করা হয়।

খবরটা শুনে মনে কষ্ট পেলাম। ছুটে গেলাম মা'র কাছে। জানতে চাইলাম, এটা কি সত্যি ? তিনি স্বীকার করলেন, সত্যি।

আপনি নিজে কি থাকবেন সংবাদ সম্মেলনে ?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, থাকব।

আমি হতভম্ব হয়ে মা'র দিকে তাকিয়ে আছি।

সেদিন মা'কে আমি কী কথা বলেছিলাম আজ আর তা মনে নেই। শুধু মনে আছে, মাথা নিচু করে ফিরে এসেছিলাম। মা শেষ পর্যন্ত সংবাদ সম্মেলনটি তাঁর ছেলে মেয়েদের করতে দেন নি। হয়তো পুত্রস্নেহের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।

আমাদের বিয়ের তিন মাসের মাথায় শাওনের মা তাঁর কন্যাকে হয়তোবা ক্ষমা করলেন। তিনিও কন্যাস্নেহের কাছে পরাজিত হলেন। শাওন তাঁর অতি আদরের ধন। তাঁর কাছে সমস্ত পৃথিবী একদিকে আর শাওন আরেক দিকে। এই অন্ধ ভালোবাসার কারণ আমি জানি। তবে এই লেখায় সেই কারণ ব্যাখ্যার সুযোগ নেই। কন্যাকে ক্ষমা করার লক্ষণ হিসেবে তিনি তাঁর পুত্রবধূর হাতে শাওনের জন্যে একসেট গয়না পাঠালেন। শাওন তার বিয়ের একমাত্র উপহার পেয়ে কেঁদেকেটে অস্থির। রাতে সে মায়ের দেওয়া প্রতিটি গয়না পরে বসে থাকল এবং কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলিয়ে ফেলল। শাওনের বাবা কঠিন অবস্থানে গেলেন। তিনি বললেন, শাওন বিয়ে করে ফেলেছে ভালো কথা, তার যেন সন্তান না হয়। তাকে আমি অবশ্যই আবার বিয়ে দেব। ছেলেমেয়ে হলে বিয়ে দিতে সমস্যা হবে।

হায়রে কপাল! শাওন কনসিভ করে ফেলল। তার কী যে আনন্দ! সন্তানের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর সে সারা রাত পাগলের মতো আচরণ করল। এই কাঁদছে এই হাসছে। আমি অবাক হয়ে তাকে দেখছি। একসময় সে আমাকে বলল, এই, আমার ছেলে হবে না মেয়ে ? আমি বললাম, তোমার মেয়ে হবে। মেয়ের নাম—লীলাবতী।

দিন কাটে, আমি অবাক হয়ে শাওনকে দেখি। সন্তান নিয়ে তার এত আনন্দ! এত অস্থিরতা! এত উত্তেজনা! প্রায় রাতেই কান্নার শব্দে ঘুম ভেঙে দেখি, সে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আমি অবাক হয়ে জানতে চাই, কাঁদছ কেন? সে বলে, আনন্দে কাঁদছি। একটি শিশু আমাকে মা ডাকবে, এই আনন্দ।

আমার আগের চারটি সন্তান আছে। তাদের মা'র মধ্যে মা হওয়ার আনন্দের এত তীব্রতা দেখি নি। কিংবা হয়তো ছিল, আমি লক্ষ করি নি। অভাব-অনটনে আমি তখন পর্যুদস্ত। গর্ভবতী মা'কে ভালো খাবার খাওয়াতে হয়, ফলমূল খাওয়াতে হয়। আমার সেই সামর্থ্য নেই। আমি তখন ঢাকা ইউনিভার্সিটির লেকচারার। অতি সামান্য বেতন। সব ভাইবোন নিয়ে একসঙ্গে থাকি। বাবর রোডে বাসা। ইউনিভার্সিটির ক্লাস শেষ করে বাসায় ফিরি হেঁটে। রিকশায় করে যাওয়ার সামর্থ্য নেই। বাসে ঠেলাঠেলি করে উঠতে পারি না। বাসায় ফেরার পথে নিউমার্কেট থেকে দুটা পেয়ারা কিনি। গর্ভবতী মায়ের ফল এই পেয়ারাতে সীমাবদ্ধ।

শীলার জন্ম আমেরিকায় হয়েছে। তখন তার মা'র খাওয়া-খাদ্যের অভাব হয় নি। দেশে ফিরে আবার অভাবে পড়লাম। বিপাশা তখন মায়ের পেটে। তখনো একান্নবর্তী সংসার। বিপাশা'র জন্ম হলো সরকারি হাসপাতালে। সরকারি হাসপাতালে খরচ কম বলেই এই ব্যবস্থা। আমি অস্থির জীবনযাপনের চিন্তায়।

এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। জীবন ধারণের অস্থিরতায় এখন আমি অস্থির না। দীর্ঘপথ হাঁটতে হয় না। ফলমূল কেনার টাকা আছে। সবচেয়ে বড় কথা, এখন আমার হাতে সময় আছে সন্তানসম্ভবা একটি মায়ের মানসিকতার পরিবর্তন আগ্রহ নিয়ে দেখার। আমি আগ্রহ নিয়ে দেখি। বড় মায়া লাগে।

একজন নর্তকী যখন মাথায় জলের ঘড়া নিয়ে নাচে তখন সে নাচের ভঙ্গিমায় হাত-পা নাড়লেও তার চেতনা থাকে জলের ঘড়ায় কেন্দ্রীভূত, যেন মাথার ঘড়াটা ঠিক থাকে। শাওন এরকম হয়ে গেল। তার ভুবন হলো লীলাবতীময়। সেখানে অন্য কারও স্থান নেই।

লীলাবতীর জন্ম হবে গরমে। তখন সে মোটা কাপড় পরতে পারবে না। কাজেই ইংল্যান্ড কানাডায় টেলিফোন করে করে সে পাতলা সুতির কাপড়ের ব্যবস্থা করল।

কার কাছে যেন শুনল ডায়াপার পরালে বাচ্চাদের র‍্যাশ হয়। কাজেই সে কাঁথা বানাতে বসল। সারা রাত জেগে নিজে কাঁথা বানায়। সেইসব কাঁথাও সহজ কাঁথা না। জসীমউদ্‌দীনের নকশি কাঁথা। পাখি ফুল লতাপাতার বিপুল সমারোহ।

এর মধ্যে 4D আলট্রাসনোগ্রাফি বলে এক যন্ত্র বাজারে চলে এসেছে। এই যন্ত্রে পেটের সন্তানের চেহারা স্পষ্ট দেখা যায়। সেই যন্ত্রে বাচ্চারা চেহারা দেখার পর তার একটাই কথা—আমার মেয়ে এত সুন্দর কেন ? আহ্লাদী মায়ের এই প্রশ্নের আমি কী জবাব দেব ?

ঘর ভর্তি হয়ে গেল 4D আলট্রাসনোগ্রাফিতে পাওয়া লীলাবতীর ছবিতে। শাওন অষ্টম মাসে পড়ল। আর মাত্র এক মাস। তার পরেই সে তার কন্যা কোলে নেবে।

আমি নুহাশপল্লীতে। নাটকের শুটিং করছি। শাওন তার মা'র কাছে গুলশানে। হঠাৎ শাওন টেলিফোন করল। কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, বাচ্চা নাড়াচাড়া করছে না। আমার খুব ভয় লাগছে।

আমি বললাম, এক্ষুনি ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করো।

যোগাযোগ করতে পারছি না। উনি টেলিফোন ধরছেন না। রাত দশটায় তিনি শুয়ে পড়েন। টেলিফোন রিসিভ করেন না। তুমি চিন্তা করবে না। আমার এক ভাই আছেন ডাক্তার। উনাকে খবর দেওয়া হয়েছে। উনি চলে আসছেন।

Murphys Law বলে একটি Law আছে। এই Law বলে, If anything can go wrong, it will go wrong. ঘটনা সেরকম ঘটল। শাওনের ডাক্তার ভাই এলেন না। আমি যতবারই টেলিফোন করি ততবারই শুনি—এই উনি আসছেন। তারপর শুনলাম, শাওনদের বাসায় গাড়ি আছে কিন্তু ড্রাইভার নেই।

গাজীপুর থেকে আমি ঢাকার দিকে রওনা হলাম। গাড়ি চলছে ঝড়ের মতো। মাজহার গাড়ি চালাচ্ছে। একইসঙ্গে টেলিফোনে শাওনের ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে।

শাওনের ডাক্তারের নাম...। আচ্ছা নাম না-ই বললাম। জনসেবার মোড়কে তিনি যে ব্যবসা করছেন আমার লেখায় সেই ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হোক তা চাই না। ব্যবসা একটা মহৎ পেশা, স্বয়ং নবিজী (দঃ) বলে গেছেন।

এই ডাক্তার একজন নামি ডাক্তার। রোগী দেখে কূল পান না। তখনো আমি জানি না এই ডাক্তারের নামে কয়েকটি মামলা আছে। তাঁর অবহেলায় রোগীর মৃত্যু হয়েছে। রোগীর আত্মীয়স্বজনেরা মামলা করেছেন।

এই মহান চিকিৎসকের ক্লিনিক একসময় টেলিফোন ধরল। এবং জানাল—রোগীকে ক্লিনিকে নিয়ে আসুন।

আমি বললাম, ক্লিনিকে রোগী পাঠাতে পারি, তবে ডাক্তার সাহেব কি এসে তাকে দেখবেন ?

উনি ভোরে আসবেন।

আমি অনুনয় করে বললাম, উনি কি আমার সঙ্গে পাঁচটা মিনিট কথা বলবেন? আমি বাংলাদেশের লেখক হুমায়ূন আহমেদ। উনি আমাকে চেনেন।

ক্লিনিক থেকে বলা হলো, উনি কথা বলবেন না।

আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। ডাক্তারি পেশা এই ডাক্তার নিজের ইচ্ছায় বেছে নিয়েছেন। আমরা তাঁকে হাতেপায়ে ধরে ডাক্তারি পড়াতে রাজি করাই নি; বরং হতদরিদ্র একটি দেশ তাঁর পেছনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে তাঁকে ডাক্তার বানিয়েছে। এই পেশার দায়দায়িত্ব অবশ্যই তাঁকে নিতে হবে। একজন কেউ যখন সৈনিকের পেশা বেছে নেয়, তখন যুদ্ধকালে জীবন দেওয়ার জন্যে তাঁকে তৈরি থাকতে হয়।

একজন ডাক্তারি পেশা বেছে নেবেন অথচ অতি দুঃসময়ে রোগীর কথা শুনবেন না, তার পাশে দাঁড়াবেন না, তা কী করে হয়?

ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগে ব্যর্থ হয়ে আমি শাওনকে বললাম, সে যেন তক্ষুনি অ্যাপোলো হাসপাতালে চলে যায়। এক মুহূর্তও যেন দেরি না করে।

আমি হাসপাতালে পৌঁছালাম রাত একটায়। ডাক্তার বললেন, আপনার বাচ্চাটা হাসপাতালে আসার আগেই মারা গেছে। আমরা এই দুঃসংবাদ আপনার স্ত্রীকে দিই নি। আপনি খবরটা দেবেন।

আমার হাত-পা জমে গেল।

শাওনকে একটা ঘরে শুইয়ে রাখা হয়েছে। পাশে তার মা। আমাকে দেখেই শাওন ভরসা ফিরে পাওয়া গলায় বলল, এই, আমাদের বাচ্চাটার হার্টবিট নাকি কম। তুমি দোয়া করো। তুমি দোয়া করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি তাকিয়ে আছি তার দিকে। এমন একটা ভয়ংকর খবর তাকে কীভাবে দেব? আমি তার হাত ধরলাম। সে বলল, জীবনের বিনিময়ে জীবন চাওয়া যায়। আমি আমার মায়ের জীবনের বিনিময়ে লীলাবতীর জীবন আল্লাহর কাছে চেয়েছি। আমার নিজের জীবনের বিনিময়ে চাই নি। আমি আমার বাচ্চাটাকে দেখব না? আর তোমার জীবনের বিনিময়েও চাইতে পারি নি।

শাওনের মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, তোমার সন্তানের জীবনের বিনিময়ে আমি যে-কোনো সময় আমার জীবন দিতে প্রস্তুত আছি গো মা।

এই মেয়েকে আমি কী বলব? কী বুঝাব?

দু'দিন দু'রাত মৃত বাচ্চা পেটে নিয়ে সে শুয়ে রইল। কী কষ্ট! কী কষ্ট! শারীরিক কষ্টের কাছে মানসিক কষ্ট গৌণ হয়ে দাঁড়াল। আমাকে জানানো হলো,

তার জীবন সংশয়। তার কষ্ট আমার পক্ষে দেখা সম্ভব না। আমি তাকে ফেলে বাসায় চলে এলাম। আমার অতি দুঃসময়ে মা এসে পাশে দাঁড়ালেন, ছুটে গেলেন হাসপাতালে।

এক গভীর রাতে আমাকে জানানো হলো, শাওন মৃত সন্তান প্রসব করেছে।

হাসপাতালে তার ঘরে ঢুকলাম। হাসিখুশি ভাব দেখিয়ে বললাম, হ্যালো।

সেও ক্লান্ত গলায় বলল, হ্যালো।

খুব চেষ্টা করছি কোনো-একটা রসিকতা করে তাকে হাসিয়ে দিতে। কিছুই মনে পড়ছে না। শেষ পর্যন্ত হাসপাতাল নিয়ে একটা রসিকতা করলাম। সে হেসে ফেলল। সে হাসছে, একইসঙ্গে তার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। অদ্ভুত দৃশ্য!

ঘরের এক কোনায় সবুজ টাওয়েলে মুড়ে কী যেন রাখা। অনেকেই সেখানে যাচ্ছেন। ফিরে আসছেন। শাওনের দৃষ্টি ওইদিকে। সে হঠাৎ বলল, ওইখানে আমাদের লীলাবতী। যাও দেখে এসো।

হাসপাতালের সবুজ টাওয়েলের ভেতর লীলাবতী শুয়ে আছে। মেয়েটি মৃত, আমার মনে রইল না। আমি মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলাম। কী সুন্দর! কী সুন্দর! পৃথিবীর সব রূপ নিয়ে সে রাঙা রাজকন্যাদের মতো ঘুমিয়ে আছে।

আমার প্রথম পুত্রও হাসপাতালে মারা গিয়েছিল। সেও এসেছিল পৃথিবীর সব রূপ নিয়ে। পরিষ্কার মনে আছে, আমার মা সেই শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে হাসপাতালের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন এবং মুগ্ধ কণ্ঠে বললেন, তোমরা সবাই দেখো আমার কোলে পদ্মফুল ফুটে আছে।

লীলাবতীর কবরের ব্যবস্থা হলো বনানী গোরস্থানে। হঠাৎ মনে হলো বিরাট ভুল হচ্ছে। লীলাবতীর কবর হবে আজিমপুর গোরস্থানে। সেখানে তার বড় ভাই আছে। বোন খেলবে ভাইয়ের হাত ধরে। পিতৃ-মাতৃস্নেহ বঞ্চিত এই দেবশিশু আর নিঃসঙ্গ বোধ করবে না।

আমি প্রায়ই আজিমপুর গোরস্থানে যাই। আমি আমার পুত্র-কন্যার জন্যে দোয়া প্রার্থনা করি না। কেন প্রার্থনা করব? তারা তো ভুল করার বা অন্যায় করার কোনো সুযোগই পায় নি। তাদের প্রার্থনার প্রয়োজন নেই। আমি কবরস্থানে ঢুকেই বলি—এই, তোমরা কোথায়? তোমাদের মজা হচ্ছে তো? ভাইবোন হাত ধরাধরি করে খুব খেলা হচ্ছে?

নিতান্তই ব্যক্তিগত কাহিনি লিখে ফেললাম। লেখকদের কাজই তো ব্যক্তিগত দুঃখবোধ ছড়িয়ে দেওয়া। এই লেখার মাধ্যমেই যারা আমাদের প্রবল দুঃসময়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের ধন্যবাদ দিচ্ছি। শাওনের বাবা ও মা'কে।

কন্যার শোকে পাথর হয়ে যাওয়া জনক-জননীর করুণ ছবি এখনো চোখে ভাসছে। শাওনের মা হাসপাতালের মেঝেতে গড়াগড়ি করে কাঁদছিলেন। আহারে! আহারে!

অ্যাপোলো হাসপাতালের একজন নার্স লীলাবতীর দিকে তাকিয়ে চোখের পানি ফেলছিল। অপরিচিত সেই নার্স মেয়েটিকেও ধন্যবাদ। তার চোখের জলের মূল্য দেওয়ার সাধ্য আমার নেই, থাকলে দিতাম।

রবীন্দ্রনাথের কাছে ফিরে যাই। তিনি লিখেছেন,

> শিশু পুষ্প আঁখি মেলি হেরিল এ ধরা
> শ্যামল, সুন্দর, স্নিগ্ধ, গীতগন্ধ-ভরা;
> বিশ্বজগতেরে ডাকি কহিল, হে প্রিয়,
> আমি যতকাল থাকি তুমিও থাকিয়ো॥

আমাদের লীলাবতী পৃথিবীর সৌন্দর্য এক পলকের জন্যেও দেখতে পেল না—এই দুঃখ আমি কোথায় রাখি?

অমরত্ব

আমার বাবার ফুফুর নাম সাফিয়া বিবি। তিনি অমরত্বের কাছাকাছি চলে গিয়েছিলেন। তাঁর স্বামী-পুত্র-কন্যা মরে গেল, নাতি মরে গেল; তিনি আর মরেন না। চোখে দেখেন না, নড়তে চড়তে পারেন না। দিন-রাত বিছানায় শুয়ে থাকার কারণে পিঠে 'বেডসোর' (শয্যাক্ষত) হয়ে গেল। পচা মাংসের গন্ধে কাছে যাওয়া যায় না। রাতে তাঁর ঘরের চারপাশে শিয়াল ঘুরঘুর করে। পচা মাংসের গন্ধে একদিন তাঁর ঘরের টিনের চালে দু'টা শকুন এসে বসল। টিন বাজিয়ে, ঢিল ছুড়ে শকুন তাড়ানো হলো। সেই তাড়ানোও সাময়িক। এরা প্রায়ই আসে। কখনো একা কখনো দলেবলে।

গ্রামের প্রচলিত বিশ্বাস, তওবা পড়ানো হলে রোগীর মৃত্যু ত্বরান্বিত হয়। তওবা পড়ানোর জন্যে মুন্সি আনা হলো। সাফিয়া বিবি বললেন, নাগো! আমি তওবার মধ্যে নাই। তওবা করতে হইলে অজু করা লাগবে। শইল্যে পানিই ছোঁয়াইতে পারি না, অজু ক্যামনে করব ?

সাফিয়া বিবির মনে হয়তো ভয় ঢুকে গিয়েছিল, তওবা মানেই মৃত্যু। তিনি মৃত্যু চান না, তবে রাত গভীর হলেই আজরাইলকে ডাকাডাকি করেন। এই ডাকাডাকি মধ্যরাতে শুরু হয়, শেষ হয় ফজর ওয়াক্তে। কারণ তখন তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। সাফিয়া বিবির আজরাইলকে ডাকার নমুনা—

ও আজরাইল! তুই কি অন্ধ হইছস ? তুই আমায় দেখস না! সবের জান কবচ করস, আমারটা করস না কেন ? আমি কী দোষ করছি ?

সাফিয়া বিবির বিলাপ চলতেই থাকে। আজরাইল তার বিলাপে সায় দেয় না। তবে এক রাতে দিল। গম্ভীর গলায় বলল, আমারে ডাকস কেন ? কী সমস্যা ?

হতভম্ব সাফিয়া বিবি বললেন, আপনি কে ?

তুই যারে ডাকস আমি সে।

সাফিয়া বিবি বললেন, আসসালামু আলায়কুম।

গম্ভীর গলা উত্তর দিল, ওয়ালাইকুম আসসালাম!

[পাঠক অবশ্যই বুঝতে পারছেন, দুষ্ট কোনো লোক আজরাইল সেজে সাফিয়া বিবির সঙ্গে মজা করছে। দুষ্টলোকের পরিচয়, তিনি আমার ছোট চাচা এরশাদুর রহমান আহমেদ। প্রাকটিক্যাল জোকের অসামান্য প্রতিভা নিয়ে আসা পৃথিবীর

অতি অকর্মণ্যদের একজন। তিনি নিশিরাতে মুখে চোঙা ফিট করে বুড়ির সঙ্গে কথা বলছেন।]

সাফিয়া বিবি! বলো কী জন্যে এত ডাকাডাকি ?

এমনি ডাকি। আমি ভালো আছি। সুখে আছি। আপনি চলে যান। কষ্ট করে এসেছেন, এইজন্যে আসসালাম।

মরতে চাও না ?

কী বলেন ? কেন মরব ? অনেক কাইজ কাম বাকি আছে।

সাফিয়া বিবি হলেন জীবনানন্দ দাশের বিখ্যাত কবিতার দু'টি লাইন—

'গলিত স্থবির ব্যাং আরও দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইশারায় অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।'

বঙ্গদেশের হতদরিদ্র সাফিয়া বিবি দুই মুহূর্তের জন্য ভিক্ষা মাগছেন। এই ভিক্ষা তো অতি ক্ষমতাবান নৃপতিরাও মাগেন। বিশ্বজয়ী চেঙ্গিস খাঁ শেষ বয়সে সমরখন্দ এসেছেন—যদি সমরখন্দের আবহাওয়ায় তাঁর শরীর কিছুটা সারে। তিনি চিকিৎসকদের হুকুম দিয়েছেন অমরত্ব পানীয় (Elixir of Life) তৈরির। যে এই পানীয় তৈরি করতে পারবে সে বেঁচে থাকবে, অন্যদের জন্যে মৃত্যুদণ্ড।

চীনের মিং সম্রাট খবর পেলেন, জিন সেং নামের এক গাছের মূলে আছে যৌবন ধরে রাখার গোপন রস। তিনি ফরমান জারি করলেন, মিং সম্রাট ছাড়া এই গাছের মূল কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। শুধু রাজকীয় বাগানে এই গাছের চাষ হবে। অবৈধভাবে কাউকে যদি এই গাছ লাগাতে দেখা যায় বা গাছের মূল সেবন করতে দেখা যায় তার জন্যে চরম শাস্তি। মৃত্যুদণ্ড।

পারস্য সম্রাট দারায়ুস খবর পেলেন, এক গুহার ভেতরে টিপটিপ করে পানির ফোঁটা পড়ে। সেই পানির ফোঁটায় আছে অমরত্ব। সঙ্গে সঙ্গে গুহার চারদিকে কঠিন পাহারা বসল। স্বর্ণভাণ্ডে সংগৃহীত হতে থাকল অমৃত। লাভ হলো না।

Elixir of Life-এর সন্ধানে এগিয়ে এলেন বিজ্ঞানীরা। তারা এটার সঙ্গে ওটা মেশান। আগুনে গরম করেন। ঝাঁকাঝাঁকি করেন। অমরত্ব ওষুধ তৈরি হয় না। সবই পণ্ডশ্রম। তবে এই পণ্ডশ্রম জন্ম দিল 'আলকেমি'র রসায়নশাস্ত্রের।

অমরত্বের চেষ্টায় মানুষ কখনো থেমে থাকে নি। যে-কোনো মূল্যেই হোক মৃত্যু ঠেকিয়ে রাখতে হবে। তা সম্ভব হলো না। মানুষ ভরসা করল মৃত্যুর পরের অমরত্বের জন্যে। পৃথিবীর সব ধর্মগ্রন্থও (মহাযান, হীনযান ছাড়া) মৃত্যুর পর অমরত্বের কথা বলছে। স্বর্গ-নরকের কথা বলছে। এই পৃথিবীতে যে অমরত্বের

সম্ভাবনা নেই পরকালে তার অনুসন্ধান। বাদ সাধল বিজ্ঞান। বিজ্ঞান বলে, মানুষের ধ্বংস হয়ে যাওয়া শরীরের ইলেকট্রন, প্রোটনে অমরত্ব আছে। কিন্তু ইলেকট্রন, প্রোটন বা নিউট্রন মানুষের স্মৃতি বহন করবে না।

এই যখন অবস্থা তখন Frank J. Tipler একটি বই লিখলেন। বইয়ের নাম *Physics of Immortality*। এই বইয়ে লেখক দেখালেন পদার্থবিদ্যার সূত্র ব্যবহার করে মৃত্যুর পর মানুষের পুনরুত্থান এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করা যায়। বইটি সম্পর্কে *New York Times* বলছে, A thrilling ride to the for edges of modern physics. সায়েন্স পত্রিকা বলছে, Tipler একটি মাস্টারপিস লিখেছেন। আমরা যা বিশ্বাস করতে চাই, পদার্থবিদ্যা দিয়ে তা-ই বলছেন।

লেখকের পরিচয় তিনি Tulane বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর অব ম্যাথমেটিক্যাল ফিজিক্স।

সমকালীন পদার্থবিদরা স্বীকার করেছেন যে, Tipler-এর বইতে পদার্থবিদ্যার কোনো সূত্রের ভুল ব্যবহার নেই। তবে...। আমি তবের ব্যাখ্যায় গেলাম না। বইটিতে ওমেগা পয়েন্টের কথা বলা হয়েছে, যেখানে ঈশ্বরের উপস্থিতি। আমি নিজে *ওমেগা পয়েন্ট* নাম দিয়ে একটি বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি লিখেছি। *ওমেগা পয়েন্টে* আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তা বলতে পারি নি।

কল্পনা করা যাক, আমগাছের মগডালে একটি পাকা আম। বানর আমটি পাড়তে পারছে না, কারণ ডাল অত্যন্ত সরু। ডাল ভেঙে পড়ে সে আহত হবে। বানরের হাতে তখন যদি একটি লাঠি দেওয়া হয়, সে লাঠি দিয়ে আম পাড়ার চেষ্টা করবে। তিনবার চেষ্টা চালিয়ে চতুর্থবার সে ডাল ফেলে চলে যাবে। মানুষ সেটা করবে না। আম না-পাড়া পর্যন্ত সে লাঠি দিয়ে চেষ্টা করেই যাবে। লাঠির সঙ্গে আরেক লাঠি যুক্ত করবে। মানুষ রণে ভঙ্গ দেবে না।

অমরত্বের সন্ধানে মানুষ কখনোই রণে ভঙ্গ দেয় নি। তাদের প্রধান চেষ্টা ছিল মৃত্যুর রহস্য ভেদ করা। শুরুতে ভাবা হয়েছে, একটি নির্দিষ্ট বয়সের পরে শারীরিক মৃত্যুঘড়ি বেজে ওঠে। তখন মৃত্যুপ্রক্রিয়া শুরু হয়। জরা আমাদের গ্রাস করতে থাকে।

এখন বলা হচ্ছে, মৃত্যুঘণ্টা বা মৃত্যুঘড়ি বলে কিছু নেই। মানবদেহ অতি আদর্শ এক যন্ত্র। যন্ত্রের দিকে খেয়াল রাখলেই জরা আমাদের গ্রাস করবে না। বায়োলজিস্টরা এখন বলছেন, জরার মূল কারণ টেলোমারস (Telomeres) কণিকাগুচ্ছ। এরা DNA-র অংশ, থাকে ক্রমোজমের শেষ প্রান্তে। যখনই কোনো

জৈবকোষ ভাঙে, টেলোমার কণিকাগুচ্ছ দৈর্ঘ্যে ছোট হতে থাকে। যখন জৈবকোষের আর কোনো টেলোমার থাকে না তখনই শুরু হয় জরা। আমরা ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগুতে থাকি।

বায়োলজিস্টরা পরীক্ষা শুরু করলেন জরাগ্রস্ত ইঁদুর নিয়ে। তাদের দেওয়া হলো টেলমোরজ (Telomerase) এনজাইম। দেখা গেল, তাদের জরা-প্রক্রিয়াই শুধু যে বন্ধ হলো তা না, তারা ফিরতে লাগল যৌবনের দিকে।

এই পরীক্ষা মানুষের ওপর করার সময় এসে গেছে। যে-কোনো দিন পত্রিকা খুলে জরা বন্ধ করার খবর পড়া যাবে। গৌতম বুদ্ধ এ সময় থাকলে আনন্দ পেতেন। তিনি জরা ও মৃত্যু নিয়ে অস্থির ছিলেন। নির্বাণে মানুষ জরা ও মৃত্যুমুক্ত হবে, এটা তাঁর শিক্ষা।

তারপর এ-কী! সত্যি কি মৃত্যুকে ঠেকানো যাচ্ছে? আমার হাতে *টাইম* পত্রিকার একটি সংখ্যা (ফেব্রুয়ারি ২১, ২০১১); প্রচ্ছদকাহিনি 2045, The year Man Becomes Immortal. প্রচ্ছদকাহিনি পড়ে জানলাম ২০৪৫ সালে মানুষ অমর হয়ে যাচ্ছে। মানুষের হাতে আসছে নতুন নতুন টেকনোলজি। টেকনোলজির বৃদ্ধি ঘটছে এক্সপোনেনশিয়েলি। ২০৪৫-এর কাছাকাছি মানুষ Singularity-তে পৌঁছবে। সিঙ্গুলারিটি শব্দটি এসেছে Astro Physics থেকে। এর অর্থ এমন এক বিন্দু, যেখানে পদার্থবিদ্যার সাধারণ সূত্র কাজ করবে না। এর মানেই অমরত্ব। ইচ্ছামৃত্যু ছাড়া মৃত্যু নেই। ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। ২০৪৫ সাল পর্যন্ত আমি এমনিতেই টিকছি না। অমরত্ব পাওয়া এই জীবনে আর হলো না। পৃথিবীতে ফিনিক ফোটা জোছনা আসবে। শ্রাবণ মাসে টিনের চালে বৃষ্টির সেতার বাজবে। সেই অপূর্ব অলৌকিক সংগীত শোনার জন্যে আমি থাকব না। কোনো মানে হয়!

প্রসঙ্গ আত্মা

ডিকশনারিতে আত্মাকে বলা হচ্ছে, মানুষের শুদ্ধতম অংশ যা মানুষের মৃত্যুর পরও অবিনাশী। পৃথিবীর সমস্ত ধর্মগ্রন্থে আত্মার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের পবিত্র কোরআনশরিফে বলা হয়েছে, আত্মা হলো আল্লাহর হুকুম (Order of God)।

বাইবেল দু' ধরনের আত্মার কথা বলে—Nefes, পশুর আত্মা যা পশুদের পরিচালিত করে। মানুষের আত্মা হলো Neshama, যা মানুষকে দিয়েছে স্বাধীন চিন্তা। (Free will, Gen 1:27)

হিন্দু *বেদ*-এ আত্মাকে দু'ভাগ করা হয়েছে—জীবাত্মা এবং পরমাত্মা। জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ।

ধর্মকথা কিছুক্ষণের জন্যে বন্ধ থাকুক। এই ফাঁকে আমরা যাই বিজ্ঞানের কাছে। বিজ্ঞান কি আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে? পৃথিবীর বড় বিজ্ঞানীদের একটি অংশ ঈশ্বরবাদী। তাঁরা আত্মার অস্তিত্ব বিশ্বাস করলেও মুখ বুজে থাকেন। সরাসরি প্রশ্ন করলে কৌশলে এড়িয়ে যান। এর মধ্যে ব্যতিক্রম দেখা গেল সার্জন ডানকান ম্যাকডুগালকে (Dunkan Macdougall)।

এই ডাক্তার ও সার্জন আত্মার অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণের পরীক্ষা শুরু করলেন। তিনি বললেন, আত্মা থাকলে তার ওজন থাকবে। মৃত্যুর পরপর মানুষের ওজন কমে যাবে। ডানকান সাহেব কাজ করতেন যক্ষ্মারোগীদের স্বাস্থ্যনিবাসে। কিছু মৃত্যুপথযাত্রী রোগী রাজি হলো জীবনের শেষ মুহূর্তে দাড়িপাল্লায় শুয়ে মারা যেতে। সব মিলিয়ে ছয়জন রোগী পাওয়া গেল। তারা বিজ্ঞানের স্বার্থে গিনিপিগ হবে।

সার্জন ডানকান পরীক্ষায় পেলেন, মৃত্যুর পরপর মানুষের ওজন একুশ গ্রাম (০.৭৫ আউন্স) কমে যায়। তাঁর এই গবেষণাপত্র বিখ্যাত জার্নাল *American Medicine*-এ প্রকাশিত হয় (১৯০৭)।

পাঠক ভেবে বসবেন না জার্নালে এই গবেষণাপত্র প্রকাশ হওয়ামাত্র বিজ্ঞানীরা বলতে শুরু করলেন, আত্মা আছে। আত্মার ওজন একুশ গ্রাম।

বিজ্ঞানের প্রধান শক্তি হলো, কেউ কিছু বলামাত্র অন্ধভাবে তা বিশ্বাস না করা। গবেষণাপত্রের ভুল বের করা। পৃথিবীর সব মহান বিজ্ঞানীকে এই

প্রতিকূলতার ঢেউ পার করে আসতে হয়েছে। আইনস্টাইনও বাদ থাকেন নি।

ডানকান সাহেবের গবেষণায় যেসব ভুল ধরা হলো তা হলো, ওজনযন্ত্রের ভুল। মাপে ভুল। শরীর থেকে বাষ্পীভূত ঘামের ওজনের হিসাব না থাকা। ইত্যাদি।

ডানকান সাহেবকে ব্যক্তিগত আক্রমণও করা হলো। বলা হলো, বাড়িতে তিনি স্ত্রী কর্তৃক নির্যাতিত পুরুষ। স্ত্রীর কাছে পাত্তা না পেয়ে তিনি বিজ্ঞানীদের কাছে পাত্তা পেতে চেয়েছেন বলেই অদ্ভুত গবেষণাপত্র ফেঁদেছেন।

বলাই বাহুল্য, শল্যবিদ ডানকান তাঁর গবেষণাপত্রের প্রতিক্রিয়ায় কিছুটা হতাশ হলেন, তবে হাল ছাড়লেন না। তিনি অন্যদের এগিয়ে আসতে বললেন। দশ বছর পর একজন এগিয়ে এলেন। তাঁর নাম এইচ লাব টুইনিং (H. Lav. Twining)। তিনি একজন পদার্থবিদ, লসএঞ্জেলস পলিটেকনিক হাইস্কুলের শিক্ষক। তিনি নিজ খরচায় একটি বই প্রকাশ করলেন, বইটির নাম *The Physical Theory of Soul*। এই গ্রন্থে মানুষের আত্মার ওজনের বদলে তিনি ইঁদুরের আত্মার ওজন বের করলেন। দাড়িপাল্লায় জীবন্ত ইঁদুর রেখে তাদের সায়ানাইড দিয়ে মৃত্যুর ব্যবস্থা করলেন। তিনি দেখলেন, মৃত্যুর পর ইঁদুরের ওজন কমে যাচ্ছে। পদার্থবিদ টুইনিং তাঁর বইতে বললেন, শুধু মানুষের না, সব প্রাণীর আত্মা আছে এবং আত্মার ওজনও আছে।

টুইনিংয়ের গবেষণায় এক ভেড়াপালক উৎসাহী হলেন। তাঁর নাম লুইস ই. হলান্ডার জুনিয়র। তিনি প্রচুর ভেড়া মারলেন। মৃত্যুর আগের ও পরের ওজন বের করলেন।

তাঁর গবেষণার ফলাফল বেশ অদ্ভুত। তিনি দেখলেন, মৃত্যুর পরপর প্রতিটি ভেড়ার ওজন বিশ থেকে ত্রিশ গ্রাম বাড়ে। এক সেকেন্ড পর বাড়তি ওজন চলে যায়। কিছু কিছু ভেড়ার ক্ষেত্রে ওজন কমে। মনে হয় এদের আত্মা আছে। অন্য ভেড়াদের নেই।

১৯৯৮ সালে ডোনাল্ড গিলবার্ড কারপেন্টার একটি বই প্রকাশ করেন। বইটির বিষয়বস্তু আত্মার ওজন কীভাবে মাপা যায় (Physically weighing the soul)। আগ্রহী পাঠক বইটি পড়ে দেখতে পারেন। সাইবারস্পেসে 1stbook.com-এ চাপলেই পাওয়া যাবে। আমি উৎসাহ বোধ করি নি বলে এই বইটি পড়া হয় নি।

এতক্ষণের আলোচনায় আমরা কী শিখলাম ? একটা জিনিসই শিখলাম, বিজ্ঞানে ভুয়া অংশ আছে। একদল মানুষের চেষ্টাই থাকে ধর্মমত প্রচারে ভুয়া বিজ্ঞান হাজির করা।

আমার মতে ধর্ম থাকবে ধর্মের মতো, বিজ্ঞান বিজ্ঞানের মতো। তেল-জলকে ঝাঁকিয়ে এক করার প্রয়োজন নেই। এমন একদিন হয়তোবা আসবে যেদিন থিওসফি ও Physics এক হয়ে যাবে। দাড়িপাল্লায় মৃত্যুপথযাত্রী পশু ও মানুষ না মেপে সেই দিনের প্রতীক্ষায় থাকাই যুক্তিযুক্ত।

পাদটীকা

আমাদের দেশে প্রচলিত ধারণা হচ্ছে, মৃত্যুর পরপর মানুষের ওজন অনেক বেড়ে যায়। আমি মনে করি, এই ধারণা মানসিক। মৃত ব্যক্তির প্রতি এক ধরনের ভীতি আমাদের মধ্যে কাজ করে। এই ভীতির কারণে মৃত ব্যক্তির ওজন বেশি মনে হয়। মিসির আলি সাহেবও হয়তো আমার সঙ্গে একমত হবেন।

মহেশের মহাযাত্রা

পরশুরামের লেখা একটি ভৌতিক গল্পের নাম 'মহেশের মহাযাত্রা'। পরশুরাম অতি পণ্ডিত এবং অতি রসিক একজন মানুষ। তাঁর রসবোধের নমুনা দেই—

রেস্টুরেন্টে এক ছেলে তার বন্ধুদের নিয়ে চা খেতে গিয়েছে। ছেলেটির বাবাও হঠাৎ করে সেখানে গেলেন। ছেলেকে রেস্টুরেন্টে আড্ডা দিতে দেখে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে প্রচুর গালাগালি করে বের হয়ে এলেন। ছেলের বন্ধুরা বলল, তোর বাবা তোকে এত গালমন্দ করল, আর তুই কিছুই বললি না ?

ছেলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, বাবার কথার কী করে জবাব দেই! একে তো তিনি বাবা, তারপর আবার বয়সেও বড়।

বাবা ছেলের চেয়ে বয়সে বড়—এই হলো পরশুরামের রসবোধ। তিনি হাসি-তামাশা, ব্যঙ্গ-রসিকতার গল্পের ভিড়ে 'মহেশের মহাযাত্রা' নামে অদ্ভুত এক ভূতের গল্পও লিখে ফেললেন। মহেশ নামের এক পাড় নাস্তিকের গল্প, যে মহেশ অংক দিয়ে প্রমাণ করেছে, ঈশ্বর সমান শূন্য।

একদল নাস্তিকের ঈশ্বরকে শূন্য প্রমাণ করার চেষ্টা যেমন আছে, আবার কঠিন আস্তিকদের চেষ্টা আছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করার। ঢাকা ইউনিভার্সিটি জার্নালে অংকের একজন শিক্ষক ইনফিনিটি সিরিজ দিয়ে প্রমাণ করলেন, ঈশ্বর আছেন। ভুবনখ্যাত অংকবিদ ইউলাম চার্চের সঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন। তিনি ব্ল্যাকবোর্ডে বিদঘুটে এক অংক লিখে বললেন, এই সমীকরণ প্রমাণ করে ঈশ্বর নেই। আপনারা কেউ কি এই সমীকরণ ভুল প্রমাণ করতে পারবেন ? চার্চের পাদরিরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন, কারণ অংক-বিষয়ে তাঁদের জ্ঞান নেই।

সম্প্রতি পত্রিকায় দেখলাম কঠিন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ স্টিফেন হকিং বলেছেন, ঈশ্বর এবং আত্মা বলে কিছু নেই। স্বর্গ-নরক নেই। সবই মানুষের কল্পনা। মানব মস্তিষ্ক হলো একটা কম্পিউটার। কারেন্ট চলে গেলে কম্পিউটার বন্ধ হয়ে যায়। মৃত্যু হলো মানব মস্তিষ্ক-নামক কম্পিউটারের কারেন্ট চলে যাওয়া।

স্টিফেন হকিং কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত। মস্তিষ্ক ছাড়া তাঁর শরীরের সব কলকব্জাই অচল। তিনি নিজেই মনে করছেন, তাঁর সময় ফুরিয়ে এসেছে। এই অবস্থায় মানুষ সাধারণত আস্তিকতার দিকে ঝুঁকে। তিনি পুরোপুরি অ্যাবাউট টার্ন

করে বললেন, ঈশ্বর নেই। কোনো পবিত্র নির্দেশ ছাড়াই (Devine intervention) বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈরি হতে পারে। শুরুতে এ ধরনের কথা সরাসরি তিনি বলতেন না। তাঁর কথাবার্তা ছিল সন্দেহবাদীদের মতো—ঈশ্বর থাকতেও পারেন, আবার নাও থাকতে পারেন।

স্টিফেন হকিংয়ের এক উক্তিতে ঈশ্বর ধ্বংস হয়ে গেছে মনে করার কারণ নেই। আবার অনেক নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থবিদের ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিষয়ে জোরালো বক্তব্যে ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা হয় না। ঈশ্বর অধরাই থেকে গেছেন।

আমি সামান্য বিপদে পড়েছি। স্টিফেন হকিংয়ের মন্তব্যে আমার কী বলার আছে, তা অনেকেই জানতে চাচ্ছেন। এইসব জটিল বিষয়ে আমি নিতান্তই অভাজন। তার পরেও বিচিত্র কারণে কিছু বলার লোভ সামলাতে পারছি না।

বিজ্ঞানীদের একটি শর্ত হকিং সাহেব পালন করেন নি। তাঁরা পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে কিছু বলেন না। যখন পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারেন না তখন বলেন, তিনি অনুমান করছেন বা তাঁর ধারণা। হকিং সরাসরি বলে বসলেন, ঈশ্বর নেই। তিনি নিজেও কিন্তু পদার্থবিদ্যায় তাঁর থিওরি একাধিকবার প্রত্যাহার করেছেন।

হকিং সাহেবের ধারণা, অমরত্ব বলে কিছু নেই। তিনি সম্ভবত ভুলে গেছেন, DNA অণু অমর। আমাদের এবং এ জগতের সৃষ্ট সকল প্রাণী ও বৃক্ষের প্রতি নির্দেশাবলী দেওয়া আছে DNA-তে। আমরা কখন যৌবনে যাব, কখন বুড়ো হব, সব নিয়ন্ত্রণ করছে DNA অণু। এই অণুই সদ্য প্রসব হওয়া গো-শাবককে জানিয়ে দিচ্ছে, একটি বিশেষ জায়গায় তোমার জন্যে তরল খাবার রাখা আছে। মুখ দিয়ে সেখানে ধাক্কা দেওয়ামাত্র তোমার খাবার বের হয়ে আসবে। আমরা বাস্তবে কী দেখি ? বাছুর মাতৃগর্ভ থেকে বের হয়ে ছুটে যাচ্ছে তার মায়ের ওলানের দিকে। তাকে কিছু বলে দিতে হচ্ছে না। তাকে নিয়ন্ত্রণ করছে রহস্যময় DNA।

এই রহস্যময় DNA কি বলে দিচ্ছে না ?—'হে মানবজাতি, তোমরা ঈশ্বরের অনুসন্ধান করো।' এই কারণেই কি মানুষ নিজের জন্যে ঘর বানানোর আগে প্রার্থনার ঘর তৈরি করে ?

হকিং বলছেন, মানব-মস্তিষ্ক কম্পিউটারের মতো। সুইচ অফ করলেই কম্পিউটার বন্ধ। মৃত্যু মানব কম্পিউটারের সুইচ অফ।

সুইচ অফ করলেও কিন্তু কম্পিউটারের মেমরি থেকে যায়। আবার পৃথিবীর সব কম্পিউটারের মেমরি কিন্তু ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংরক্ষণ সম্ভব।

মহা মহা শক্তিধর (আল্লাহ্, ঈশ্বর, গড) কারও পক্ষে একইভাবে প্রতিটি মানুষের মেমরি সংরক্ষণও সম্ভব। তখনো কিন্তু আমরা অমর। সংরক্ষিত মেমরি দিয়ে প্রাণ সৃষ্টিও সেই মহাশক্তিধরের কাছে কোনো বিষয়ই না।

মানুষ নিজেও মহা মহা শক্তিধর। সেই মানুষ কোনো কারণ ছাড়াই সৃষ্টি হয়ে গেল? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোনো বিশৃঙ্খলা নেই। তাকে কঠিন শৃঙ্খলার মধ্যে রাখা হয়েছে। তাকে পদার্থবিদ্যার প্রতিটি সূত্র মেনে চলতে হচ্ছে। এই সূত্রগুলি আপনাআপনি হয়ে গেছে? এর পেছনে কি কোনো পবিত্র আদেশ (Devine order) নেই?

একদল বলছেন, প্রাণের সৃষ্টি 'Chaos' থেকে। অণুতে অণুতে ধাক্কাধাক্কিতে জটিল যৌগ তৈরি হলো। একসময় জটিল যৌগ আরও জটিল হলো। সে নিজের মতো আরও অণু তৈরি করল। সৃষ্টি হলো প্রাণ। অণুতে অণুতে ধাক্কাধাক্কিতে একদিকে তৈরি হলো ধীমান মানুষ; অন্যদিকে তৈরি হলো গোলাপ, যার সৌন্দর্য ধীমান মানুষ বুঝতে পারছে। ব্যাপারটা খুব বেশি কাকতালীয় নয় কি?

আমি ওল্ড ফুলস ক্লাবের আড্ডায় প্রায়ই ঈশ্বর-বিষয়ক একটি গল্প বলি। পাঠকদের গল্পটি জানাচ্ছি। ধরা যাক, এক কঠিন নাস্তিক মঙ্গল গ্রহে গিয়েছেন। সেখানকার প্রাণহীন প্রস্তরসংকুল ভূমি দেখে তিনি বলতে পারেন—একে কেউ সৃষ্টি করে নি। অনাদিকাল থেকে এটা ছিল। তার এই বক্তব্যে কেউ তেমন বাধা দিবে না। কিন্তু তিনি যদি মঙ্গল গ্রহে হাঁটতে হাঁটতে একটা ডিজিটাল নাইকন ক্যামেরা পেয়ে যান তা হলে তাঁকে বলতেই হবে, এই ক্যামেরা আপনাআপনি হয় নি। এর একজন সৃষ্টিকর্তা আছে। মনে করা যাক, ক্যামেরা হাতে তিনি আরও কিছুদূর গেলেন, এমন সময় গর্ত থেকে একটা খরগোস বের হয়ে এল। যে খরগোসের চোখ নাইকন ক্যামেরার চেয়েও হাজার গুণ জটিল। তখন কি তিনি স্বীকার করবেন যে, এই খরগোসের একজন সৃষ্টিকর্তা আছে?

মনে হয় স্বীকার করবেন না, কারণ নাস্তিক আস্তিক দুই দলই জেগে ঘুমিয়ে থাকার ভান করেন বলে তাদের ঘুম ভাঙানো যায় না। বিপদে পড়েন সন্দেহবাদীরা। যত দিন যায় ততই তাদের সন্দেহ বাড়তে থাকে। বাড়তেই থাকে।

পাদটীকা

রাতের অন্ধকারে এক অতি ধার্মিক বাড়িঘর ছেড়ে পথে নেমেছেন। তাঁকে একজন জিজ্ঞেস করল, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বললেন, ঈশ্বরের সন্ধানে।

সেই লোক অবাক হয়ে বলল, সে-কী! ঈশ্বর কি হারিয়ে গেছেন যে তার সন্ধানে বের হতে হচ্ছে?

হাসপাতাল

ঢাকার বক্ষব্যাধি হাসপাতালের একটি কেবিন।

কবি শামসুর রাহমান শুয়ে আছেন। তাঁর নাকে অক্সিজেনের নল। গায়ে হাসপাতালের পোশাক নেই। লুঙ্গি-গেঞ্জি পরে শুয়ে আছেন। গেঞ্জি গলা পর্যন্ত ওঠানো বলে কবির বুক যে হাপরের মতো ওঠানামা করছে তা দেখা যাচ্ছে। কবি চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছেন। তাঁর দৃষ্টিতে প্রাণের স্পর্শ নেই।

হাসপাতালের ওই কেবিনে আমার সঙ্গে আছেন সৈয়দ শামসুল হক এবং *দৈনিক বাংলার* সহকারী-সম্পাদক সালেহ চৌধুরী। আরও কেউ কেউ হয়তো ছিলেন, তাদের নাম মনে করতে পারছি না। আমরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে কবির রোগযন্ত্রণা দেখছি, হঠাৎ সৈয়দ শামসুল হক নৈঃশব্দ ভঙ্গ করলেন। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'কবি, আপনাকে বাঁচতেই হবে। আমি আমার আয়ু থেকে খানিকটা আপনাকে দিলাম।'

ঘোষণায় নাটকীয়তা ছিল, আবেগ ছিল, যুক্তি ছিল না। একজন তার আয়ুর খানিকটা অন্যকে দিতে পারেন না। বাংলাদেশের সব মানুষ এক মিনিট করে আয়ু কবিকে দান করলে কবি বেঁচে থাকতেন তিন শ' বছর।

তবে মোঘল সম্রাট বাবর তাঁর পুত্র হুমায়ূনকে নিজের আয়ু দান করেছিলেন। ঘটনাটা এ রকম—হুমায়ূন মৃত্যুশয্যায়। চিকিৎসকদের সব চিকিৎসা ব্যর্থ। এইসময় সুফি দরবেশ মীর আবুল কাশেম সম্রাটকে বললেন, আপনি আপনার জীবনের একটি অতি প্রিয় জিনিসের বিনিময়ে পুত্রের জীবন ভিক্ষা চাইতে পারেন। এটা হবে শেষ চেষ্টা।

সম্রাট বাবর বললেন, আমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস হলো নিজ জীবন। এর বিনিময়ে আমি পুত্রের জীবন ভিক্ষা চাইব।

মীর আবুল কাশেম আঁতকে উঠে বললেন, কী সর্বনাশ! নিজের জীবন না, আপনি বরং বহুমূল্যবান কোহিনূর হীরা দান করে দিন।

সম্রাট বললেন, আমার পুত্রের জীবন কি সামান্য হীরকখণ্ডের তুল্যমূল্য? আমি আমার জীবনের বিনিময়ে পুত্রের জীবন ভিক্ষা চাইব।

সম্রাট তিনবার পুত্রের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে প্রার্থনা করলেন। তিনবার বললেন, পুত্র, তোমার সমস্ত ব্যাধি আমি নিজ দেহে তুলে নিলাম। পরম করুণাময়, আমার প্রার্থনা কবুল করো।

হুমায়ূন অবচেতন অবস্থা থেকে চেতন অবস্থায় এসে পানি খেতে চাইলেন আর বাবর হলেন অসুস্থ।

আমার নিজের জীবনেও এরকম একটি ঘটনা আছে। আমার ছেলে রাশেদ হুমায়ূনের বয়স দুই দিন। তাকে ইনকিউবেটরে রাখা হয়েছে। সে মারা যাচ্ছে। আমি হাসপাতাল থেকে শহীদুল্লাহ হলের বাসায় ফিরে এলাম। অজু করে জায়নামাজে দাঁড়ালাম। আমি ঠিক করলাম, সম্রাট বাবরের মতো নিজের জীবনের বিনিময়ে পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা চাইব। জায়নামাজে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হলো, এই প্রার্থনা কবুল হবে।

শেষ মুহূর্তে প্রবল ভীতি আমাকে আচ্ছন্ন করল। আমি জীবনের বিনিময়ে জীবনের প্রার্থনা করতে পারি নি। আমি আমার মৃত শিশুপুত্রের কাছে লজ্জিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী।

নুহাশপল্লীর ঔষধি উদ্যানে একটি স্মৃতিফলক আছে— 'রাশেদ হুমায়ূন ঔষধি উদ্যান'। তার নিচে লেখা—'আমার ছোট্ট বাবাকে মনে করছি।'

আমার শিশুপুত্র তিন দিনের আয়ু নিয়ে অদ্ভুত সুন্দর পৃথিবীতে এসেছিল। সে এই সৌন্দর্যের কিছুই দেখে নি। আমি প্রায়ই নিজেকে এর জন্যে দায়ী করি।

থাকুক পুরনো কথা, হাসপাতালের অন্য গল্প করি।

গল্প-১

স্থান : হৃদরোগ ইনস্টিটিউট। শেরেবাংলা নগর।

আমার বড় ধরনের হার্টঅ্যাটাক হয়েছে। ভর্তি হয়েছি হাসপাতালে। নানান যন্ত্রপাতি এবং মনিটর শরীরে লাগানো। আমার বড় ছেলে নুহাশ আমাকে দেখতে এসেছে। নুহাশের বয়স পাঁচ। সে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মনিটরের দিকে। মনিটরে ঢেউয়ের মতো রেখা দেখা যাচ্ছে।

নুহাশ বলল, বাবা, এখানে কী হচ্ছে আমি জানি।

কী হচ্ছে?

এই যে ঢেউয়ের মতো রেখাগুলি দেখছ, একসময় রেখা সমান হয়ে স্ট্রেইট লাইন হবে। তখন তুমি মারা যাবে।

আমি বললাম, ও!

নুহাশ গভীর আগ্রহ নিয়ে মনিটর দেখছে। কখন স্ট্রেইট লাইন হবে কখন তার বাবা মারা যাবে এই প্রতীক্ষা।

গল্প-২

স্থান : বেলিভিউ হাসপাতাল। নিউইয়র্ক।

আমার এনজিওগ্রাম করা হবে। পায়ের ধমনী কেটে একটা সুঁই ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। সেই সুঁই চলে যাবে হৃৎপিণ্ডে। আমাকে বলা হয়েছে, এই পদ্ধতিতে প্রতি এক হাজারে একজন মারা যায়। আমি কাগজপত্রে সই করে জানিয়েছি মৃত্যু হলে দায়দায়িত্ব হাসপাতালের না, আমার।

অপারেশন হবে ভোর ন'টায়। আগের রাতে আমার কাছে হাসপাতালের একজন কাউন্সিলর এলেন। তিনি বললেন, তুমি কি মুসলিম ?

হ্যাঁ।

কাল ভোরে তোমার অপারেশন। তুমি কি চাও তোমার জন্যে তোমার ধর্মমতে প্রার্থনা করা হোক ?

তার মানে কী ?

এই হাসপাতালে রোগীদের জন্যে প্রার্থনার ব্যবস্থা আছে। প্রার্থনার জন্যে আলাদা ফি আছে। তুমি ফি'র ডলার জমা দিলেই প্রার্থনার ব্যবস্থা হবে।

হাসপাতাল হলো চিকিৎসার জায়গা। প্রার্থনার জায়গা— এটা জানতাম না।

কাউন্সিলর বললেন, সমীক্ষায় দেখা গেছে যাদের জন্যে প্রার্থনা করা হয় তাদের আরোগ্যের হার বেশি। এইজন্যেই প্রার্থনা বিভাগ খোলা হয়েছে।

আমি প্রার্থনা করাব না। অর্থের বিনিময়ে প্রার্থনায় আমার বিশ্বাস নেই।

তোমার অপারেশনটি জটিল। তুমি যদি চাও আমি ডিসকাউন্টে প্রার্থনার জন্যে সুপারিশ করতে পারি। একজন মুসলমান আলেম প্রার্থনা করবেন।

ডিসকাউন্টের প্রার্থনাতেও আমার বিশ্বাস নেই।

তুমি কি নাস্তিক ?

আমি নাস্তিক না বলেই ডিসকাউন্টের প্রার্থনায় বিশ্বাসী না।

ভোর ন'টায় এনজিওগ্রাম শুরু হলো। ডাক্তার একজন অল্পবয়েসী তরুণী। আমেরিকান না, ভারতীয় তরুণী। সে কিছু-একটা গণ্ডগোল করল। ধমনী ফেটে রক্ত ছিটকে বের হয়ে আমার সামনের মনিটরে পড়ল। ডাক্তারের চোখেমুখেও পড়ল। আমি ইংরেজিতে জানতে চাইলাম, কোনো সমস্যা কি হয়েছে?

তরুণী বলল, Stay calm. অর্থাৎ শান্ত থাকো।

আমাকে শান্ত থাকতে বলে সে যথেষ্টই অশান্ত হয়ে পড়ল। একটা পর্যায়ে তাকে সাহায্য করার জন্যে অন্য ডাক্তার চেয়ে পাঠাল। আমি মনে মনে বললাম, ডিসকাউন্টের প্রার্থনা নেওয়াই মনে হয় উচিত ছিল।

গল্প-৩

স্থান : মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতাল। সিঙ্গাপুর।

মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চতুর্থবারের মতো আমার এনজিওগ্রাম করা হয়েছে। রাতটা হাসপাতালের কেবিনে কাটাতে হবে। পরদিন ছুটি। খরচ কমানোর জন্যে সিঙ্গেল কেবিন না নিয়ে ডাবল কেবিন নিয়েছি। আমার পাশে আরেকজন অতি বৃদ্ধ চায়নিজ রোগী। দু'জনের মাঝখানে পর্দা আছে। পর্দার ফাঁক দিয়ে আমি বৃদ্ধ রোগীকে দেখতে পাচ্ছি।

রোগীর অবস্থা শোচনীয়। তার মুখে বেলুনের মতো কী যেন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে বেলুন ফুলছে এবং সংকুচিত হচ্ছে। অনেকটা ব্যাঙের গলার ফুলকার মতো। রোগী ঘড়ঘড় শব্দ করছে। ভয়ঙ্কর রকম আহত জন্তু হয়তোবা এরকম শব্দ করে।

রোগীকে দেখার জন্যে একের পর এক তার আত্মীয়স্বজন আসছে। কিছুক্ষণ কেঁদে স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। অনেককে দেখলাম রোগীর বালিশের নিচে টাকা গুঁজে দিচ্ছে। দর্শনার্থীরা কেউ কেউ বাচ্চা নিয়ে আসছে। বাবা-মা বাচ্চাদের উঁচু করে রোগীকে দেখাচ্ছে। অনেকটা শেষ দেখার মতো।

কুমিরের বাচ্চার মতো দেখানো শেষ হওয়ামাত্র বাচ্চাগুলিকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমার দিকে। এরা শুরু করে কিচিরমিচির। কেউ কেউ চেষ্টা করে আমার বিছানায় উঠতে।

একসময় মধ্যবয়স্ক এক মহিলা এসে বিনয়ে নিচু হয়ে আমাকে জানাল, তার দাদা মারা যাচ্ছেন বলে সবাই দেখতে আসছে। আমাকে যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে যেতে হচ্ছে বলে তাদের লজ্জার সীমা নেই। আমি যেন ক্ষমা করে দেই।

রাত দশটায় নার্স আমার জন্যে ওষুধ নিয়ে এল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ওই বৃদ্ধের কী হয়েছে?

নার্স বলল, বার্ধক্য ব্যাধি।

অবস্থা কি খারাপ?

যথেষ্টই খারাপ। ঘটনা রাতেই ঘটবে।

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, কেউ রাতে মারা গেলে তার ডেডবডি কি তোমরা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাও, না পরে নাও?

অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা হয়।

আমি বললাম, আমি মৃত মানুষ পাশে নিয়ে কখনো শুয়ে থাকি নি। আমাকে কি অন্য একটা কেবিনে দেওয়া যাবে?

নার্স বলল, অবশ্যই যাবে। তুমি ওষুধ খাও, আমি ব্যবস্থা করছি।

আমি ওষুধ খেলাম। নিশ্চয়ই কড়া কোনো ঘুমের ওষুধ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল ভোরবেলা। আমি আমার নিজের কেবিনেই আছি। পর্দার ওপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কোনো শব্দও নেই। সুনসান নীরবতা। ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটে গেছে।

আমি অতি কষ্টে বিছানা থেকে নামলাম। উঁকি দিলাম পাশের বিছানায়। বৃদ্ধ হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে বসে আছে। বৃদ্ধের মুখ হাসিহাসি। সে চামচ দিয়ে স্যুপ খাচ্ছে। আমাকে দেখে বলল, গুড মর্নিং।

আমি বললাম, গুড মর্নিং।

বৃদ্ধ হাত ইশারা করে আমাকে কাছে ডাকল। বিড়বিড় করে চায়নিজ ভাষায় কী যেন বলল। আমি কাছে এগিয়ে

গেলাম। বৃদ্ধ বালিশের নিচে হাত দিয়ে এক শ' সিঙ্গাপুর ডলারের একটা নোট আমার দিকে বাড়িয়ে বলল, টেক টেক টেক। মনে হয় জীবন ফিরে পেয়ে সে মহা আনন্দিত। এই আনন্দের খানিকটা ভাগ আমাকে দিতে চায়। (পাঠকদের কী ধারণা—আমি কি বৃদ্ধের উপহার নিয়েছি, নাকি নেই নি ? কুইজ।)

পাদটীকা-১

এইবার ইউরোপের অতি উন্নত একটি দেশের অদ্ভুত চিকিৎসার গল্প। দেশটির নাম সুইডেন। সেই দেশে বাঙালি এক মহিলা দাঁতের সমস্যা নিয়ে গেছেন। দাঁতের ডাক্তার পরীক্ষা করে আঁতকে উঠে বললেন, দাঁতের গোড়ায় ভয়ঙ্কর এক জীবাণু পাওয়া গেছে। এই জীবাণু হার্টে চলে যাওয়া মানে হার্ট ফেইলিউর। তিনি ব্যবস্থা দিলেন রোগীর সব দাঁত জরুরি ব্যবস্থায় তুলে ফেলতে হবে। মহিলা শুরু করলেন কান্না। মহিলার মেয়ে একজন ডাক্তার। সে মা'কে বলল, মা, তোমার চিকিৎসা হচ্ছে সুইডেনে, এত ভালো চিকিৎসা কোথাও হবে না। দাঁত ফেলতে বলছে, ফেলে দাও।

বেচারির সব সুস্থ দাঁত টেনে তুলে ফেলে দেওয়া হলো। তাকে ভর্তি করা হলো ভয়ঙ্কর জীবাণুর চিকিৎসা যে হাসপাতালে হয় সেখানে। ডাক্তাররা ভয়ঙ্কর জীবাণুর সন্ধানে লেগে গেলেন। একসময় ঘোষণা করলেন, এই জীবাণুর কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি। ভুল হয়েছে। ভুলের কারণেই সব দাঁত ফেলা হয়েছে। তারা দুঃখিত।

ভদ্রমহিলা হচ্ছেন নির্বাসিতা লেখিকা তসলিমা নাসরিনের মা। তসলিমা নাসরিন মা'কে চিকিৎসা করাতে সুইডেনে নিয়ে গিয়েছিলেন।

পাদটীকা-২

আমি কখনোই মনে করি না মানুষ এমন কোনো অপরাধ করতে পারে যার শাস্তি তার কাছ থেকে দেশ কেড়ে নেওয়া।

মানুষ মানুষকে ত্যাগ করে। দেশ কখনো তার সন্তানকে ত্যাগ করে না। যারা তসলিমা নাসরিনের রচনা পছন্দ করেন না তারা পড়বেন না। তসলিমা নাসরিন যদি বিভ্রান্ত হয়ে থাকেন, তিনি থাকবেন তার বিভ্রান্তি নিয়ে, আমরা কেন তাকে দেশছাড়া করব ? কেন বাংলাদেশের একটা মেয়ে ভবঘুরের মতো এক দেশ থেকে আরেক দেশে ঘুরবে ? ভয়ঙ্কর সব যুদ্ধাপরাধী তো ঠিকই বাংলাদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা তো তাদের দেশান্তরী করি নি।

চ্যালেঞ্জার

কী-এক উৎসব উপলক্ষে আমরা অর্থাৎ ওল্ড ফুলস ক্লাবের সদস্যরা একটা হোটেলের বড় ঘরে জড়ো হয়েছি। সেখানে মধ্যবয়স্ক অচেনা এক ব্যক্তি ঢুকল। আমি ভুরু কুঁচকে তাকালাম। বৃদ্ধ বোকা সংঘের আড্ডায় কখনো অপরিচিতজনদের আসতে দেওয়া হয় না। এ কে ? এখানে কী চায় ?

পরিচয়ে জানলাম—তার একটা প্রেস আছে। সেই প্রেসে 'অন্যপ্রকাশ'-এর বইয়ের কভার মাঝে মাঝে ছাপা হয়। সে এসেছে অন্যপ্রকাশের মালিক মাজহারের কাছে। তার কিছু টাকা দরকার।

বেচারা বিব্রত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। আমি বললাম, আপনি বসুন।

সে সংকুচিত ভঙ্গিতে বসল।

আড্ডা জমে উঠল। আমি তার কথা ভুলেই গেছি। নিজের মনে কথা বলে যাচ্ছি। যুক্তিতর্কের আসর জমেছে। এখন মনে পড়ছে না কী-একটা যুক্তি দিলাম। হঠাৎ সে বলল, এখন আপনি যে যুক্তিটা দিলেন তাতে ভুল আছে।

আমি বললাম, কী ভুল ?

সে আমার যুক্তির ভুল ব্যাখ্যা করল। ব্যাখ্যা সঠিক। আমি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বললাম, আপনার কী নাম ?

স্যার, আমার নাম সাদেক।

আপনি এত পিছনে কেন ? কাছে এগিয়ে আসুন। সাদেক কাছে এগিয়ে এল। এই আসরেই তার নতুন নাম করা হলো 'চ্যালেঞ্জার'।

তার নামকরণে আমার কোনো ভূমিকা ছিল না। নামকরণ করেছিলেন 'অবসর প্রকাশনা'র মালিক আলমগীর রহমান। সাদেক আলমগীর রহমানের দিকে একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে চ্যালেঞ্জ জিতে নেন বলেই নাম চ্যালেঞ্জার। সাদেক কী বিষয়ে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন তা বলতে চাইছি না। কোনো এক বিশেষ তরল পদার্থ গলধঃকরণ বিষয়ক চ্যালেঞ্জ। ধরা যাক পেপসি। আলমগীর আট বোতল পেপসি খেয়ে বমি শুরু করল। চ্যালেঞ্জার নয় বোতল খেয়ে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সবার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগল, যেন কিছুই হয় নি।

তাকে আমি প্রথম যে নাটকে নিলাম, তার নাম 'হাবলঙের বাজার'। নাটকের কাহিনি হচ্ছে, গরমের সময় ডাক্তার এজাজের মাথা এলোমেলো হয়। তার বিয়ের

দিন খুব গরম পড়ার কারণে মাথা এলোমেলো হয়ে গেল। ঠিক করা হলো, মাথা কামিয়ে সেখানে মাথা গরমের এলাজ দেওয়া হবে। শট নেওয়ার আগে আগে দেখা গেল নাপিত আনা হয় নি। নাপিতের সন্ধানে লোক পাঠানো হলো। সে ক্ষুর-কাঁচি পাঠিয়ে দিল। নিজে এল না। তার ভয় সে এলেই তাকে নাটকে নামিয়ে দেওয়া হবে। আমি পড়লাম বিপাকে।

কীভাবে নাটক বানানো হয় তা দেখার জন্যে চ্যালেঞ্জার তার স্ত্রীকে নিয়ে এসেছে। দু'জনই আগ্রহ নিয়ে নাটক বানানো দেখছে। আমি চ্যালেঞ্জারের দিকে তাকিয়ে বললাম, তুমি তো সব কিছুকেই চ্যালেঞ্জ হিসাবে নাও। এসো নাপিতের ভূমিকায় অভিনয় করো।

চ্যালেঞ্জার বলল, স্যার, আপনি যা বলবেন তা-ই করব। মাটি খেতে বলতে মাটি খাব। নাটক পারব না।

আমি বললাম, তুমি পারবে। নাও, ক্ষুর হাতে নাও।

চ্যালেঞ্জার ছোট্ট একটা ভূমিকায় অভিনয় করল। আমি সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম, তার ভেতর সহজাত অভিনয়ের আশ্চর্য ক্ষমতা আছে।

তাকে একঘণ্টার একটি নাটকে প্রধান চরিত্র করতে বললাম, নাটকের নাম 'খোয়াবনগর'। সেখানে আমার মেজ মেয়ে শীলা অভিনয় করেছিল। নাটকের শেষে আমি মেয়েকে জিজ্ঞেস করলাম, বাবা! চ্যালেঞ্জার নামের এই নতুন অভিনেতার অভিনয় তোমার কেমন লাগল?

শীলা বলল, আসাদুজ্জামান নূর চাচাকে আমার এ দেশের সবচেয়ে বড় অভিনেতা বলে মনে হয়। আমি আজ যার সঙ্গে অভিনয় করলাম, তিনি নূর চাচার চেয়ে কোনো অংশে কম না।

বাবা! তোমার কি মনে হয় একদিন সুপার স্টার হিসেবে তার পরিচয় হবে?

শীলা বলল, অবশ্যই।

'উড়ে যায় বকপক্ষী'তে পাগলের ভূমিকায় অভিনয় করে সে নিজেকে সুপার স্টার প্রমাণিত করল।

আমি কোনো অবিচুয়ারি লিখছি না। চ্যালেঞ্জার এখনো জীবিত। আজ দুপুরে সে তার স্ত্রীকে ইশারায় বলল, সে আমাকে দেখতে চায়।

তার স্ত্রী তাকে নিয়ে বাসায় উপস্থিত হলো। দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। চ্যালেঞ্জারের কথা বলার ক্ষমতা নেই। যে কথা বলতে পারছে না, তার সঙ্গে কথা বলে তার যন্ত্রণা বাড়ানোর কোনো মানে হয় না।

চ্যালেঞ্জার সম্পর্কে দু'টি ছোটগল্প বলতে ইচ্ছা করছে।

গল্প-১

আমি আমার মেয়ে বিপাশা ও পুত্র নুহাশকে নিয়ে কক্সবাজার গিয়েছি। তখন আমি মূল পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। একা বাস করি। আমার এই দুই পুত্র-কন্যা হঠাৎ করেই ঠিক করল, বাবার সঙ্গে কিছু সময় কাটাবে। কাজেই তাদের নিয়ে এসেছি সমুদ্রের কাছে। উঠেছি হোটেল সায়মনে। খুব ভোরবেলা দরজায় নক হচ্ছে। দরজা খুললাম, অবাক হয়ে দেখি, এক কাপ গরম চা এবং খবরের কাগজ হাতে চ্যালেঞ্জার দাঁড়িয়ে আছে। সে আমাকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্যে সারা রাত গাড়ি চালিয়ে ঢাকা থেকে চলে এসেছে।

গল্প-২

'দখিন হাওয়া'র ফ্ল্যাটে আমি একা থাকি। শীলার মা'র সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়ার কারণে ওল্ড ফুলস ক্লাবের সব সদস্য আমাকে ত্যাগ করেছে। কেউ ফ্ল্যাটে আসে না। হঠাৎ কারও সঙ্গে দেখা হলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়। অদ্ভুত ভঙ্গিতে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। আমার সেই দুঃসময়ের কাল বেশ দীর্ঘ ছিল। তখন প্রতিদিন দুপুরে এবং রাতে চ্যালেঞ্জার এসে বসে থাকত। সে আমার সঙ্গে খাবে। তার একটাই যুক্তি— 'স্যার, আপনি একা খেতে পছন্দ করেন না। আমি কখনোই আপনাকে একা খেতে দেব না।' একসময় ওল্ড ফুলস ক্লাবের সদস্যরা আসতে শুরু করল। চ্যালেঞ্জার দূরে সরে গেল।

চ্যালেঞ্জারের নিজের একটা গল্প বলি। সে ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় তার সৎমা'র অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ছোট ছোট ভাইবোন নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে এসেছিল। তার নিজের ভাষ্যমতে, 'স্যার, কত দিন গিয়েছে কোনো খাওয়া নাই। গ্লাসভর্তি চা নিজে খেয়েছি। ভাইবোনদের খাইয়েছি।' বড় ভাইয়ের দায়িত্ব সে পুরোপুরি পালন করেছিল, সব ক'টা ভাইবোনকে পড়াশোনা করিয়েছে, বিয়ে দিয়েছে। তারচেয়েও অদ্ভুত কথা, সে তার সৎমাকে নিজের কাছে এনে যতটুকু আদর-যত্ন করা যায় করেছে। মৃত্যুর সময় এই মহিলা তার সৎ ছেলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। বলেছিলেন, আমি কঠিন অন্যায়-অত্যাচার তোমাদের ওপর

করেছি। তারপরেও তুমি নিজের মায়ের মতো সেবাযত্ন আমাকে করলে। আমি দোয়া করি, তোমার জীবন হবে আনন্দ এবং ভালোবাসায় পূর্ণ।

দুষ্ট মানুষের প্রার্থনা মনে হয় আল্লাহপাক গ্রহণ করেন না। চ্যালেঞ্জার এখন জম্বী। তাকিয়ে থাকা ছাড়া তার কিছু করার নেই। ব্রেইন ক্যানসার নামক কালান্তক ব্যাধি তার কাছ থেকে সবকিছু নিয়ে নিয়েছে।

বাংলাদেশের মানুষ সাহায্যের হাত গাঢ় মমতায় তার দিকে বাড়িয়েছে বলেই সে এখনো বেঁচে আছে।

তার সাহায্যের জন্যে চ্যানেল আই মহৎ উদ্যোগ নিয়েছিল। দিনব্যাপী অনুষ্ঠান। অনেকেই এগিয়ে এসেছেন। তবে সাহায্যের নামে কেউ কেউ প্রতারণাও করেছেন। চ্যানেল আইয়ের ক্যামেরার সামনে বড় বড় ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁদের নাম প্রচারিত হয়েছে—এই পর্যন্তই। যাঁরা এই কাজটি করেছেন তাঁদের নাম উল্লেখ করলাম না। আল্লাহপাক মানী মানুষের মান রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁরা মানী লোক।

এই প্রসঙ্গে আমি দেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে একটি আন্তরিক ধন্যবাদ দিতে চাই। তাঁকে আমি একটি ব্যক্তিগত চিঠি লিখে জনাব আসাদুজ্জামান নূরের হাত দিয়ে পাঠাই। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ তাঁর মঙ্গল করুন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে লেখা ব্যক্তিগত পত্রটি সংযুক্ত হলো।

৫ আগস্ট, ২০০৯
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
দেশরত্ন শেখ হাসিনা

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আমার বিনীত সালাম গ্রহণ করুন।

আপনি প্রচুর বইপত্র পড়েন—এই তথ্য আমার জানা আছে। নাটক-সিনেমা দেখার সুযোগ পান কি না জানি না। সুযোগ পেলে চ্যালেঞ্জার নামের একজন শক্তিমান অভিনেতার অভিনয় আপনার দেখার কথা। অতি অল্প সময়ে সে অভিনয় দিয়ে দেশবাসীর হৃদয় হরণ করেছে।

বর্তমানে সে মস্তিষ্কের ক্যানসারে আক্রান্ত। তার চিকিৎসা চলছে সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে। চিকিৎসার বিপুল ব্যয়ভার তার পরিবার আর নিতে পারছে না।

আমি তার হয়ে আপনার কোমল মানবিক সত্তার কাছে আবেদন করছি। আপনার মঙ্গলময় হাত কি এই শক্তিমান অসহায় অভিনেতার দিকে প্রসারিত করা যায়?

বিনীত

হুমায়ূন আহমেদ

পাদটীকা

How many loved your moments of glad grace
And loved your beauty with love false or true,
But one man loved the pilgrim soul in you,
And loved the sorrows of your changing face.

W.B.Yeats

মানব এবং দানব

বাঘের গর্ভে সব সময় বাঘ জন্মায়, সাপ জন্ম দেয় সাপের। মানুষ একমাত্র প্রাণী যে মানুষের জন্ম দেয়, আবার দানবের জন্মও দেয়। দানবদের কর্মকাণ্ড দেখে লজ্জায় মাথা নিচু করে আছি, কারণ এই দানবেরা বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর অংশ, এরা ভিনগ্রহ থেকে আসে নি।

পিলখানার খুব কাছাকাছি আমি থাকি। বুধবার সকাল থেকেই গুলির শব্দ শুনছিলাম। গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার কিছু ছিল না। 'বিডিআর সপ্তাহ' চলছে, তাদের কর্মকাণ্ড থাকতে পারে। অথচ তখন একে একে প্রাণ দিচ্ছিলেন নিরস্ত্র একদল অসহায় মানুষ। অস্ত্রধারী দানবদের ঠেকানোর কোনো উপায় তাঁদের ছিল না। মৃত্যুর আগমুহূর্ত পর্যন্ত তাঁদের চিন্তা-চেতনায় ছিল তাঁদের শিশুসন্তান এবং পরিবার। 'আমরা চলে যাচ্ছি, দানবদের থাবা থেকে তারা রক্ষা পাবে তো?'

পরম করুণাময়ের অসীম করুণায় জিম্মিদের প্রায় সবাইকে আমরা রক্ষা করতে পেরেছি।

এই উদ্ধার-প্রক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব জাতি মনে রাখবে কি না আমি জানি না। ব্যক্তিগতভাবে আমি আমৃত্যু মনে রাখব। তিনি যখন বজ্রকঠিন গলায় বললেন, 'কঠোর ব্যবস্থা নিতে আমাকে বাধ্য করবেন না।'—তখনই তাঁর কাঠিন্য দানবদের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিল।

টক শোর জমানায় চ্যানেলে নানান টক শো চলছে। এদের কাউকে কাউকে বলতে শুনেছি—অনেক আগেই মিলিটারি অ্যাকশনে যাওয়া উচিত ছিল। মিলিটারি দেখামাত্র 'বিডিআর ছোকরারা' অস্ত্র ফেলে দৌড় দেবে।

যদি বিদ্রোহীরা তা না করত তখন কী হতো? যে অস্ত্রধারী জানে, তার সামনে নিশ্চিত মৃত্যু, সে কী পরিমাণ ভয়ংকর হতে পারে—এই বিষয়ে কি টক শো'র জেনারেল সাহেব জানেন? কতগুলো নারী এবং শিশু তখন তাদের হাতে জিম্মি। যে-কোনো মূল্যে এদের আমাদের রক্ষা করতে হবে এবং তা-ই করা হয়েছে।

নানান দুঃখকষ্টের ভেতর দিয়ে আমরা এগোচ্ছি বলে আমাদের হৃদয়ে কাঠিন্য চলে এসেছে। সহজে আমাদের চোখ অশ্রুসজল হয় না। বিডিআরের এই ঘটনা পুরো জাতিকে কাঁদিয়েছে। দানবেরা কি এই অশ্রুর মূল্য জানে?

সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ি যখন বিডিআর গেট দিয়ে প্রথম ঢুকছে, তখন সাঁজোয়া গাড়ির চালক কাঁদছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমিও কাঁদছিলাম।

পুলিশের আইজি নূর মোহাম্মদ সাহেবকে দেখেও আমার চোখ ভিজে উঠল। তিনি তাঁর মেয়েজামাইকে হারিয়েছেন। হৃদয়ে কপাট লাগিয়ে পুলিশ বাহিনীকে নিয়ে শান্তমুখে নিজ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। আহা রে!

স্বজনহারারা যে-রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদছিলেন তার নাম বীর উত্তম এম এ রব সড়ক। মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের একজন বীর উত্তম। দানবেরা তাদের ঐতিহ্য ভুলে গেছে? বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক মুন্সী আব্দুর রউফ এবং বীরশ্রেষ্ঠ ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ তো তাদেরই পূর্বসূরি, যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

স্বামীহারা কিছু মহিলার হতাশ ছবি টিভিতে দেখলাম। তাঁরা বলছেন, 'এখন আমাদের সন্তানদের কীভাবে মানুষ করব?' ঠিক তাঁদের মতোই একদিন আমার মা-ও কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন, 'আমি আমার ছয়টা ছেলেমেয়েকে কীভাবে মানুষ করব?' তখন তাঁর পাশে কেউ ছিল না। পরম করুণাময় আমার মা এবং তাঁর সন্তানদের ওপর করুণাধারা বর্ষণ করেছেন।

যেসব স্বামীহারা মা আজ সন্তানদের চিন্তায় অস্থির হচ্ছেন তাঁদের বলছি, আপনাদের পেছনে পুরো জাতি আছে। পরম করুণাময়ের করুণাধারার বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে।

আমার খুব ইচ্ছা করছে পিতাহারা সন্তানদের পাশে বসে কিছুক্ষণ গল্প করি। তাদের পিঠে হাত রেখে বলি—এই দিন দিন নয়, আরও দিন আছে। এই দিনেরে নিবে তোমরা সেই দিনের কাছে।

উন্মাদ-কথা

সন্তানদের নাম সাধারণত বাবা-মা কিংবা অন্য গুরুজনরা রাখেন। আমার সর্বকনিষ্ঠ ভাই আহসান হাবীবের নাম আমার রাখা। বাবা তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের জন্যে নাম খুঁজছিলেন। আমার এক বন্ধুর নাম আহসান হাবীব। দুর্দান্ত ভালো ছেলে (এখন আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে ইকনমিক্সের অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট তবলাবাদক। বাঙালিদের গানের অনুষ্ঠান তার তবলাবাদন না হলে জমে না।) আমি বাবাকে বললাম, আহসান হাবীব নামটা কি রাখবেন ? আমার বন্ধু এবং খুব ভালো ছেলে।

বাবা তাঁর নিউমরোলজির বইপত্র খুললেন। হিসাবনিকাশ করে বললেন, নিউমরোলজিতে ভালো আসছে। আহসান হাবীব নামের জাতকের জীবন শুভ হবে। এই নামই রাখা হলো। খাসি জবেহ্ করে আকিকা করা হলো না। বাবার সেই সামর্থ্য ছিল না। অনেক বছর পর যখন আমার সামান্য টাকাপয়সা হলো তখন আমি যেসব ভাইবোনের আকিকা করা হয় নি তাদের নামে আকিকার ব্যবস্থা করলাম। এই ঘটনায় আমার মা পরম সন্তোষ লাভ করলেন।

ছোট ভাইয়ের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। সে ছিল অতি রূপবান এক বালক। গায়ের রঙ দুধে-আলতা টাইপ। শৈশবে তার 'হজকিনস ডিজিজ' হয়েছিল। তাকে কঠিন চিকিৎসার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছিল বলেই হয়তো রঙের এমন পরিবর্তন।

প্রিয় পাঠক, শৈশবে আমার গায়ের রঙও নাকি দুধে-আলতা টাইপ ছিল। (আমার মায়ের ভাষ্য।) একবার কঠিন রক্ত-আমাশা হলো। আমার গায়ের রঙ হয়ে গেল শ্রীলংকানদের মতো। ছোটবেলায় আমার গায়ের রঙ কী ছিল আমার মনে নেই, তবে আমার মা যে কালো ছিলেন সেটা মনে আছে। মা'র কাছে শুনেছি, বাবা একটা কালো মেয়ে বিয়ে করে এনেছেন, এই নিয়ে দাদার বাড়িতে অনেক 'মন্তব্য' করা হয়েছে। মা'কে আড়ালে চোখের পানি ফেলতে হয়েছে। সেই কালো মহিলাকে এখন দেখলে চমকাতে হয়। ধবধবে সাদা রঙ। এই মহিলা নিজের দুই পুত্রকে কালো বানিয়ে নিজে কীভাবে গৌরবর্ণ ধারণ করলেন কে জানে! জগৎ রহস্যময়।

রঙ-প্রসঙ্গ আপাতত থাকুক। আহসান হাবীব প্রসঙ্গে আসি। সে ছিল বাবার অতি প্রিয়পুত্র। দু'টি কারণে প্রিয়।

১. মজার মজার গল্প বলত। তার গল্প শুনে বাবা হো হো করে হাসতেন। বেচারাকে একই গল্প প্রতিদিন তিন-চারবার করে শোনাতে হতো।

২. তার গলায় সুর ছিল। যে-কোনো গান একবার শুনলেই নির্ভুল সুরে গাইতে পারত।

আহসান হাবীব প্রথম গুণটি নিয়ে এখন জীবন চালিয়ে যাচ্ছে। *উন্মাদ* পত্রিকা, রম্য লেখা, জোকসের বই। প্রতি বইমেলাতে তার জোকসের বই বের করা রেওয়াজে দাঁড়িয়ে গেছে।

তার দ্বিতীয় গুণটি বিকশিত হয় নি। সে কাউকে গান গেয়ে শুনিয়েছে এমন শোনা যায় নি। গান গাওয়ার প্রতিভা বিকশিত হলে এখন হয়তো তার কয়েকটি গানের ক্যাসেট থাকত। *উন্মাদের* বিশেষ সংখ্যার সঙ্গে একটা শ্যাম্পুর মিনি প্যাক, কফির মিনি প্যাক এবং আহসান হাবীবের গানের CD ফ্রি দেওয়া হতো।

সে মোটামুটি রেজাল্ট করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জিওগ্রাফিতে M.Sc. করল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামীণ ব্যাংকে ভালো চাকরি পেল। চাকরি ঢাকার বাইরে। সাত দিনের মাথায় চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঢাকায় উপস্থিত। মা'কে বলল, সকালবেলায় নাশতার সমস্যা, এইজন্যে চাকরিতে রিজাইন দিয়ে চলে এসেছি।

মা'র কাছে মনে হলো চাকরি ছাড়ার কারণ ঠিকই আছে। যেখানে খাওয়াদাওয়ার সমস্যা, সেই চাকরি করার দরকার কী ? তিনি ছেলেকে কাছে পেয়ে বরং খুশি হলেন।

নাশতা সমস্যায় এমন একটা ভালো চাকরি ছাড়ার যুক্তি আমার কাছে কখনোই গ্রহণযোগ্য মনে হয় নি। আমার ধারণা, ঢাকায় সে বন্ধুবান্ধব ফেলে গেছে। তাদের টানেই চাকরি ছেড়ে চলে এসেছে। তার কাছে বন্ধুবান্ধব অতি গুরুত্বপূর্ণ। আমি যে তাকে ডেকে কিছু উপদেশ দেব তাও সম্ভব না। কারণ উপদেশ দেওয়ার বিষয়টা আমাদের পরিবারে নাই। আমরা উপদেশ দেই না, কারও উপদেশ শুনিও না।

অবশ্য তাকে উপদেশ দেওয়ার যোগ্যতাও আমার ছিল না। সে বড় হয়েছে একা একা। আমি তখন সংসার নামক ঠেলাগাড়ি ঠেলতে ব্যস্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারারের সামান্য কিছু টাকা সম্বল। বিরাট সংসার। আমরা ছয় ভাইবোন, মা। আমার ছোটমামাও আমাদের সঙ্গে থেকে পড়াশোনা করেন। কোনোদিকে তাকানোর অবস্থা নেই। আহসান হাবীব স্কুলে ভর্তি হবে। কে তাকে নিয়ে যাবে ? বেচারা নিজেই খুঁজে খুঁজে একটা স্কুল বের করল। মা'র কাছ থেকে টাকা নিয়ে ভর্তি হয়ে গেল। স্কুলের হেডমাস্টার সাহেব বললেন, বাবা, তোমার গার্জিয়ান

কোথায় ? সে হাসিমুখে বলল, স্যার, আমিই আমার গার্জিয়ান। কখন সে পাস করল, কখন কলেজে গেল, কলেজ শেষ করে ইউনিভার্সিটিতে—কিছুই তো জানি না। তাকে কী করে আমি বলি, তোমার ভালো চাকরি মন দিয়ে করা দরকার।

সে তার *উন্মাদ* পত্রিকা নিয়ে আছে। ভালো আছে বলেই আমার ধারণা। আর ভালো না থাকলেই বা কী!

আহসান হাবীবকে নিয়ে লেখার একটা আলাদা কারণ আছে। কারণটা শুনলে পাঠক বিস্মিত হবেন বলেই এই লেখা।

আহসান হাবীব শব্দের রঙ দেখতে পায়। সে বলে যখনই কোনো শব্দ হয় তখনই সে সেই শব্দের রঙ দেখে। কখনো নীল, কখনো লাল, সবুজ, কমলা। মাঝে মাঝে এমন সব রঙ দেখে যার অস্তিত্ব বাস্তব পৃথিবীতে নেই।

তরুণ গবেষক হিসেবে আমি তাকে নিয়ে কিছু গবেষণাও করি। হারমোনিয়ামের একেক রিড একেক ফ্রিকোয়েন্সিতে বাজে। আমি তাকে আলাদা আলাদা করে প্রতিটি ফ্রিকোয়েন্সি বাজিয়ে শোনালাম। সে রঙ বলল। আমি লিখে রাখলাম। পনেরো দিন পর আবারও সেই পরীক্ষা। রঙগুলো যদি বানিয়ে বানিয়ে বলে তাহলে দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় এলোমেলো ফল আসবে। আরেকটু পরিষ্কার করে বলি। গানের সাতটা স্বর হলো—সা রে গা মা পা ধা নি। প্রথমবারের পরীক্ষায় সে বলেছে—

সা : নীল
রে : সবুজ
গা : গাঢ় সবুজ
মা : কমলা

ইত্যাদি।

পনেরো দিন পর একই পরীক্ষা যদি করা হয়, তাহলে একই উত্তর তাকে দিতে হবে। ভিন্ন উত্তর দিলে বুঝতে হবে রঙের ব্যাপারটা সে বানিয়ে বানিয়ে বলছে।

ঘটনা সেরকম ঘটল না। সে একই উত্তর দিল। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। এ ধরনের রঙ দেখার কারও ক্ষমতা আছে তা আমার চিন্তাতেও ছিল না।

তার মতো ক্ষমতা যে আরও কিছু মানুষের আছে তা জানলাম রাশিয়ান একটা পত্রিকা পড়ে। পত্রিকার নাম *Sputnik*। *রিডার্স ডাইজেস্ট*-এর মতো পত্রিকা। সেখানে বিশাল এক প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে যার বিষয় 'কিছু কিছু মানুষের শব্দের রঙ দেখার অস্বাভাবিক ক্ষমতা'।

উন্মাদ অফিসে বসে আহসান হাবীব এখনো রঙ দেখে কি না জানি না। আমরা ভাইবোনরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। কেউ কারও খবর রাখি না। বাবা-মা-ভাইবোনকে নিয়ে একসময় ভালোবাসার বৃত্তের মধ্যে একটা সংসার ছিল। সেই বৃত্ত ভেঙে গেছে। নতুন বৃত্ত তৈরি করে প্রত্যেকেই আলাদা সংসার করছি। আমাদের সবার ভুবনই আলাদা। এই ভুবনও একদিন ভাঙবে। আমরা অচেনা এক বৃত্তের দিকে যাত্রা শুরু করব। সেই বৃত্ত কেমন কে জানে! পৃথিবীতেই এত রহস্য। না জানি কত রহস্য অপেক্ষা করছে অদেখা ভুবনে।

অসুখ

ছোটখাটো অসুখ আমার কখনো হয় না। সর্দিকাশি-জ্বর কখনো না। পচা, বাসি খাবার খেয়েও আমার পেট নামে না। ব্যাকপেইনে কাতর হয়ে বিছানায় পড়ে থাকি না। আধকপালি, সম্পূর্ণ কপালি কোনো কপালি মাথাব্যথা নেই। মুড়িমুড়কির মতো প্যারাসিটামল আমাকে খেতে হয় না।

এক বিকেলে দু'টা Ace নামের প্যারাসিটামল খেয়ে ফেললাম। শাওন বিস্মিত হয়ে বলল, মাথাব্যথা ?

আমি বললাম, না। এক সাহিত্য অনুষ্ঠানে যাব। সেখানে মাথা ধরতে পারে ভেবেই অ্যাডভান্স ওষুধ খাওয়া।

ছোট রোগ-ব্যাধি যাদের হয় না, তাদের জন্যে অপেক্ষা করে বড় অসুখ। একদিন কথা নেই বার্তা নেই গলা দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। এক চামচ দু' চামচ না, কাপভর্তি রক্ত। আমি হতভম্ব। কিছুক্ষণের মধ্যে নাক দিয়েও রক্তপাত শুরু হলো। আমার শরীরে এত রক্ত আছে ভেবে কিছুটা আহ্লাদও হলো।

তখন আমি চিটাগাংয়ের এক হোটেলে। শিশুপুত্র নিষাদকে নিয়ে শাওন আছে আমার সঙ্গে। নিষাদ অবাক হয়ে তার মা'কে জিজ্ঞেস করল, মা, এত রক্ত দিয়ে আমরা কী করব ?

আমি তার কথায় হো হো করে হাসছি। শাওন বলল, এই অবস্থায় তোমার হাসি আসছে ?

আমি সঙ্গে সঙ্গে হাসি বন্ধ করলাম। আসলেই তো এই অবস্থায় হাসা ঠিক না। আমার উচিত কাগজ-কলম নিয়ে এপিটাফ লিখে ফেলা। কল্পনায় দেখছি নুহাশপল্লীর সবুজের মধ্যে ধবধবে শ্বেতপাথরের কবর। তার গায়ে লেখা—

'চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে
নিয়ো না, নিয়ো না সরায়ে।'

এখন বলি হার্ট অ্যাটাকের গল্প। সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে আমার চিকিৎসা চলছে। প্রথম ধাক্কা সামলে ফেলেছি। আজরাইল খাটের নিচেই ছিল। ডাক্তারদের প্রাণপণ চেষ্টায় বেচারাকে মন খারাপ করে চলে যেতে হয়েছে। আমাকে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কেবিনে। কত দিন থাকতে হবে ডাক্তাররা পরিষ্কার করে বলছেন না।

এক সকালবেলায় হাসপাতালের লোকজনের মধ্যে অতিরিক্ত ব্যস্ততা দেখা গেল। আমার বিছানার চাদর বদলে দেওয়া হলো। জানালায় পর্দা লাগানো হলো। ঝাড়ুদার এসে বিপুল উৎসাহে ফিনাইল দিয়ে মেঝে ঘষতে লাগল। তারপর দেখি তিনজন অস্ত্রধারী পুলিশ। একজন ঢুকে গেল বাথরুমে, দু'জন চলে গেল বারান্দায়। আমি ডিউটি ডাক্তারকে বললাম, ভাই, আমাকে কি অ্যারেস্ট করা হয়েছে? অপরাধ কী করেছি তাও তো জানি না।

ডিউটি ডাক্তার বললেন, বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট শাহাবুদ্দিন সাহেব আপনাকে দেখতে আসছেন।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন?

সেটা তো আমরাও জানি না। প্রেসিডেন্টের প্রেস সচিব খবর দিয়েছেন, তিনি আপনাকে দেখতে আসবেন।

আমি মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেলাম, এই দফায় আমি মারা যাচ্ছি। শুধু মৃত্যুপথযাত্রী কবি-সাহিত্যিকদেরকেই দেশের প্রধানরা দেখতে আসেন।

প্রেসিডেন্ট শাহাবুদ্দিন আমার প্রিয় মানুষদের একজন। তাঁর সততা, দেশের প্রতি ভালোবাসা তুলনাহীন। তিনি আমাকে দেখতে আসছেন জেনে নিজেকে খানিকটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে।

ছোটখাটো মানুষটা দুপুরের দিকে এলেন। বিছানার পাশে রাখা চেয়ারে বসলেন। যে কথাটা বললেন তাতে সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে পানি এসে গেল। তিনি ময়মনসিংহের ভাষায় বললেন, এখন মারা গেলে চলবে? আপনার নোবেল পুরস্কার আনতে হবে না!

আমি বললাম, আপনি কি জানেন এই মুহূর্তে আপনি আমাকে যে পুরস্কার দিয়েছেন তা নোবেল পুরস্কারের চেয়েও বড়?

থাকুক এসব কথা, বাইপাস অপারেশনের গল্পে চলে যাই। সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথের ডাক্তার আমার বাইপাস করবেন। অপারেশন হবে ভোরবেলায়। সন্ধ্যাবেলায় ডাক্তার আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মূল কারণ আমাকে সাহস দেওয়া।

আমি বললাম, ঠিক করে বলুন তো ডাক্তার, অপারেশনে আমার মৃত্যুর আশঙ্কা আছে না? আপনি কি ১০০ ভাগ গ্যারান্টি দিতে পারবেন যে বেঁচে থাকব?

না।

মৃত্যুর আশঙ্কা কত ভাগ?

ফাইভ পার্সেন্ট।

তাহলে আজ রাত বারোটা পর্যন্ত আমাকে ছুটি দিন। রাত বারোটা পর্যন্ত আমি আনন্দ করব। এক গ্লাস ওয়াইন খাব। সিগারেট খাব। মনের আনন্দ নিয়ে সিঙ্গাপুরের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দেখব। রাত বারোটা বাজার আগেই ফিরে আসব।

ডাক্তার বললেন, কাল ভোরবেলায় আপনার অপারেশন। মেডিকেশন শুরু হয়ে গেছে। এখন এসব কী বলছেন?

আমি বললাম, অপারেশনের পর আমি তো মারাও যেতে পারি।

আপনি কী করেন জানতে পারি?

আমি একজন লেখক। গল্প বানাই।

একজন লেখকের পক্ষেই এমন উদ্ভট প্রস্তাব দেওয়া সম্ভব। আচ্ছা দেখি আমি কিছু করতে পারি কি না। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে রাজি করানো কঠিন হবে।

আশ্চর্যের ব্যাপার, বিশেষ ব্যবস্থায় আমাকে রাত বারোটা পর্যন্ত ছুটি দেওয়া হলো। মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালের আমিই নাকি প্রথম বাইপাস পেশেন্ট— যাকে এই সুবিধা দেওয়া হয়েছে।

অপারেশন টেবিলে আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দু'জন নার্স চাকা লাগানো বিছানা ঠেলতে ঠেলতে নিচ্ছে। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। একজন হাস্যমুখি আবার হি হি করে কিছুক্ষণ পরপর হাসছে। তার গা থেকে বোটকা গন্ধও আসছে। চায়নিজ মেয়েদের গা থেকে গা গুলানো গন্ধ আসে। চায়নিজ ছেলেরা হয়তো এই গন্ধের জন্যেই পাগল।

আমি চোখ বন্ধ করলাম। কোনো সুন্দর দৃশ্যের কল্পনা করা যায় কি না তার চেষ্টা। জোছনাস্নাত অপূর্ব কোনো রজনীর স্মৃতি। কিংবা শ্রাবণের ক্লান্তিবিহীন বৃষ্টির দিনের স্মৃতি। কিছুই মাথায় আসছে না। চোখ মেললাম এনেসথেসিস্টের কথায়। এনেসথেসিস্ট বললেন (তিনি একজন মহিলা), তুমি ভয় পাচ্ছ?

আমি বললাম, না।

আশ্চর্যের কথা, আসলেই ভয় পাচ্ছিলাম না। কেন ভয় পাচ্ছি না তাও বুঝতে পারছি না। পরে শুনেছি ভয় কমানোর একটা ইনজেকশন নাকি তারা দেয়।

অজ্ঞান করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। শরীর হালকা হতে শুরু করেছে। অস্পষ্টভাবে কোনো-একটা বাদ্যযন্ত্রের বাজনা কানে আসছে। হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে কেউ বাদ্যযন্ত্র বাজাবে না। তাহলে কে বাজাচ্ছে?

সে

এরশাদ সাহেবের সময়কার কথা। সরকারি পর্যায়ে শিলাইদহে রবীন্দ্রজয়ন্তি হবে। আমার কাছে জানতে চাওয়া হলো আমি উৎসবে যোগ দেব কি না।

আমি বললাম, রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে যে-কোনো নিমন্ত্রণে আমি আছি। এরশাদ সাহেবের উদ্যোগে অনুষ্ঠান হচ্ছে, হোক না, আমি কোনো সমস্যা দেখছি না। রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসার অধিকার সবারই আছে।

যথাসময়ে শিলাইদহে উপস্থিত হলাম। কুঠিবাড়িতে পা দিয়ে গায়ে রোমাঞ্চ হলো। মনে হলো পবিত্র তীর্থস্থানে এসেছি। এক ধরনের অস্বস্তিও হতে লাগল, মনে হলো—এই যে নিজের মনে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না। চারদিকে রবীন্দ্রনাথের পায়ের ধুলা ছড়িয়ে আছে। কবির কত স্মৃতি, কত আনন্দ-বেদনা মিশে আছে প্রতি ধূলিকণায়। সেই ধুলার ওপর দিয়ে আমি হেঁটে যাব, তা কি হয়? এত স্পর্ধা কি আমার মতো অভাজনের থাকা উচিত?

নিজের মনে ঘুরে বেড়াতে এত ভালো লাগছে! কুঠিবাড়ির একটা ঘরে দেখলাম কবির লেখার চেয়ার-টেবিল। এই চেয়ারে বসেই কবি কত-না বিখ্যাত গল্প লিখেছেন। কুঠিবাড়ির দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে চোখে পড়ল কবির প্রিয় নদী প্রমত্তা পদ্মা। ১২৯৮ সনের এক ফাল্গুনে এই পদ্মার দুলুনি খেতে খেতে বজরায় আধশোয়া হয়ে বসে কবি লিখেছেন,

শ্রাবণ গগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে
শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী!

একদিকে উৎসব হচ্ছে, গান, কবিতা আলোচনা; অন্যদিকে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি নিজের মনে। সন্ধ্যাবেলা কুঠিবাড়ির গানের অনুষ্ঠানে আমি নিমন্ত্রিত অতিথি, উপস্থিত না থাকলে ভালো দেখায় না বলে প্যান্ডেলের নিচে গিয়ে বসেছি। শুরু হলো বৃষ্টি, ভয়াবহ বৃষ্টি। সেইসঙ্গে দমকা বাতাস। বাতাসে সরকারি প্যান্ডেলের অর্ধেক উড়ে গেল। আমি রওনা হলাম পদ্মার দিকে। এমন ঝমঝম

বৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথও নিশ্চয়ই ভিজতেন। আমি যদি না ভিজি তাহলে কবির প্রতি অসম্মান করা হবে।

বৃষ্টিতে ভেজা আমার জন্যে নতুন কিছু না। কিন্তু সেদিনকার বৃষ্টির পানি ছিল বরফের চেয়েও ঠান্ডা। আর হাওয়া ? মনে হচ্ছে সাইবেরিয়া থেকে উড়ে আসছে। আমি ঠকঠক করে কাঁপছি। নবধারা জলে স্নানের আনন্দ ধুয়ে-মুছে গেছে। রেস্ট হাউজে ফিরে শুকনো কাপড় পরতে পারলে বাঁচি।

কাঁপতে কাঁপতে ফিরছি। পদ্মা থেকে কুঠিবাড়ি অনেকটা দূর। কাঁচা রাস্তা। বৃষ্টির পানিতে সেই রাস্তা কাদা হয়ে গেছে। দ্রুত হাঁটা যাচ্ছে না। জায়গাটাও অন্ধকার। আধাআধি পথ এসে থমকে দাঁড়ালাম। কে যেন রাস্তার পাশে গাছের নিচে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে আলো করে বিদ্যুৎ চমকালো। আর তখনই আমার সারা শরীর দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। আমি স্পষ্ট দেখলাম, গাছের নিচে যুবক বয়সের রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে আছেন। এটা কি কোনো মায়া ? কোনো ভ্রান্তি ? বিচিত্র কোনো হেলুসিনেশন ? আমার চিন্তা-চেতনা জুড়ে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বলেই তাঁকে দেখছি ?

আমি চিৎকার করতে যাচ্ছিলাম। তার আগেই ছায়ামূর্তি বলল, কে, হুমায়ূন ভাই না ?

নিজেকে চট করে সামলে নিলাম। রবীন্দ্রনাথের প্রেতাত্মা নিশ্চয়ই আমাকে 'হুমায়ূন ভাই' বলবে না। আমি ভৌতিক কিছু দেখছি না। এমন একজনকে দেখছি যে আমাকে চেনে এবং যাকে অন্ধকারে খানিকটা রবীন্দ্রনাথের মতো দেখায়। ছায়ামূর্তি বলল, হুমায়ূন ভাই, বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে কোথায় যাচ্ছেন ?

আমি বললাম, কুঠিবাড়ির দিকে যাচ্ছি। আমি কি আপনাকে চিনি ?

জি-না, আপনি আমাকে চেনেন না। হুমায়ূন ভাই, আমি আপনার অনেক ছোট। আপনি আমাকে তুমি করে বলবেন।

তোমার নাম কী ?

রবি।

ও আচ্ছা, রবি।

আমি আবার বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গেলাম। নাম রবি মানে ? হচ্ছেটা কী ?

রবি বলল, চলুন, আমি আপনার সঙ্গে যাই।

চলো।

ভিজতে ভিজতে আমরা কুঠিবাড়িতে উপস্থিত হলাম। ঝড়ের প্রথম ঝাপটায় ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়েছিল, এখন আবার এসেছে। চারদিকে আলো ঝলমল করছে। আলোতে আমি আমার সঙ্গীকে দেখলাম, এবং আবারও চমকালাম। অবিকল যুবক বয়সের রবীন্দ্রনাথ। আমি বললাম, তোমাকে দেখে যে আমি বারবার চমকাচ্ছি তা কি তুমি বুঝতে পারছ ?

পারছি। আপনার মতো অনেকেই চমকায়। তবে আপনি অনেক বেশি চমকাচ্ছেন।

তোমার নাম নিশ্চয়ই রবি না ?

জি-না। যারা যারা আমাকে দেখে চমকায় তাদের আমি এই নাম বলি।

এসো, আমরা কোথাও বসে গল্প করি।

আপনি ভেজা কাপড় বদলাবেন না ? আপনার তো ঠান্ডা লেগে যাবে।

লাগুক ঠান্ডা।

আমরা একটা বাঁধানো আমগাছের নিচে গিয়ে বসলাম। রবি উঠে গিয়ে কোত্থেকে এক চাওয়ালাকে ধরে নিয়ে এল। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে বৃষ্টি পড়ছে। আমি আধভেজা সিগারেট ধরিয়ে টানছি। চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছি। সেই চা-ও বৃষ্টির পানির মতোই ঠান্ডা। খুবই লৌকিক পরিবেশ। তারপরেও আমি লক্ষ করলাম, আমার বিস্ময়বোধ দূর হচ্ছে না।

রবি হাসিমুখে বলল, হুমায়ূন ভাই! আমি শুনেছিলাম আপনি খুব সিরিয়াস ধরনের মানুষ। আপনি যে বাচ্চাদের মতো বৃষ্টিতে ভিজে আনন্দ করেন তা ভাবি নি। আপনাকে দেখে আমার খুব মজা লেগেছে।

আমি বললাম, তোমাকে দেখে শুরুতে আমার লেগেছিল ভয়। এখন লাগছে বিস্ময়।

আপনি এত বিস্মিত হচ্ছেন কেন ? মানুষের চেহারার সঙ্গে মানুষের মিল থাকে না ?

থাকে, এতটা থাকে না।

রবির সঙ্গে আমার আরও কিছুক্ষণ গল্প করার ইচ্ছা ছিল। সম্ভব হলো না। সরকারি বাস কুষ্টিয়ার দিকে রওনা হচ্ছে। বাস মিস করলে সমস্যা। রবি আমার সঙ্গে এল না। সে আরও কিছুক্ষণ থাকবে। পরে রিকশায় করে যাবে। তবে সে যে ক'দিন অনুষ্ঠান চলবে, রোজই আসবে। কাজেই তার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ রয়ে গেল।

রাতে রেস্টহাউজে ফিরে আমার কেন জানি মনে হলো পুরো ব্যাপারটাই মায়া। ছেলেটির সঙ্গে আর কখনোই আমার দেখা হবে না। রাতে ভালো ঘুমও হলো না।

আশ্চর্যের ব্যাপার! পরদিন সত্যি সত্যি ছেলেটির দেখা পেলাম না। অনেক খুঁজলাম। কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করলাম, দেখতে অবিকল রবীন্দ্রনাথের মতো এমন একজনকে দেখেছেন ?

তারা সবাই আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন আমি কিছুক্ষণ আগেই গাঁজা খেয়ে এসেছি। ওই জিনিস তখন কুঠিবাড়ির আশপাশে খাওয়া হচ্ছে। লালন শাহ্-র কিছু অনুসারী এসেছেন। তাঁরা গাঁজার ওপরই মত্ত আছেন। উৎকট গন্ধে তাঁদের কাছে যাওয়া যায় না। তাঁদের একজন আমাকে হাত ইশারা করে কাছে ডেকে বলছেন, আচ্ছা স্যার, রবিঠাকুর যে লালন শাহ্-র গানের খাতা চুরি করে নোবেল পেল এই বিষয়ে ভদ্রসমাজে কিছু আলোচনা করবেন। এটা অধীনের নিবেদন।

তৃতীয় দিনেও যখন ছেলেটার দেখা পেলাম না, তখন নিশ্চিত হলাম, ঝড়-বৃষ্টির রাতে যা দেখেছি তার সবটাই ভ্রান্তি। মধুর ভ্রান্তি। নানান ধরনের যুক্তিও আমার মনে আসতে লাগল। যেমন, আমি যখন জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কী করো ? সে জবাব দেয় নি। আমার সঙ্গে সরকারি বাসে আসতেও রাজি হয় নি। নিজের আসল নামটিও বলে নি।

অনুষ্ঠানের শেষ দিনে দেখি সে প্যান্ডেলের এক কোনায় চুপচাপ বসে আছে।

আমি এগিয়ে গেলাম।

এই রবি, এই।

রবি হাসিমুখে তাকাল, এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠে এল। আমি বললাম, এই ক'দিন আস নি কেন ?

শরীরটা খারাপ করেছিল। ওই দিন বৃষ্টিতে ভিজে ঠান্ডা লেগে গেল।

আজ শরীর কেমন ?

আজ ভালো।

এই ক'দিন আমি তোমাকে খুব খুঁজেছি।

আমি অনুমান করেছি। আচ্ছা হুমায়ূন ভাই, দিনের আলোতেও কি আমাকে রবীন্দ্রনাথের মতো লাগে ?

হ্যাঁ লাগে, বরং অনেক বেশি লাগে।

সে ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, দেখুন মানুষের ভাগ্য। আমি শুধু দেখতে রবীন্দ্রনাথের মতো, এই কারণে আপনি কত আগ্রহ করে আমার সঙ্গে কথা বলছেন।

তার জন্য কি তোমার খারাপ লাগছে ?

না। খারাপ লাগছে না। ভালো লাগছে। খুব ভালো লাগছে। নিজেকে মিথ্যামিথ্যি রবীন্দ্রনাথ ভাবতেও আমার ভালো লাগে।

তুমি টিভিতে কখনো নাটক করেছ ?

কেন বলুন তো ?

তোমাকে আমি টিভি নাটকে ব্যবহার করতে চাই।

আমি কোনোদিন নাটক করি নি, কিন্তু আপনি বললে আমি খুব আগ্রহ নিয়ে করব। কী নাটক ?

এই ধরো, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নাটক। যৌবনের রবীন্দ্রনাথ। কুঠিবাড়িতে থাকেন। পদ্মার তীরে হাঁটেন। গান লিখেন, গান করেন। এইসব নিয়ে ডকুমেন্টারি ধরনের নাটক।

আপনি লিখবেন ?

হ্যাঁ, লিখব। একটা কাগজে তোমার ঠিকানা লিখে দাও।

ঠিকানা আপনি হারিয়ে ফেলবেন। আমি বরং আপনাকে খুঁজে বের করব।

ছুটির সময়ে মন সাধারণত তরল ও দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। ছুটির সময়ে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পরে আর মনে থাকে না। আমার বেলায় সেরকম হলো না। আমি ঢাকায় ফিরেই টিভির নওয়াজিশ আলি খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। আমার পরিকল্পনার কথা বললাম। তিনি এক কথায় বাতিল করে দিলেন। তিনি বললেন, রবিঠাকুরকে সরাসরি দেখাতে গেলে অনেক সমস্যা হবে। সমালোচনা হবে। রবীন্দ্রভক্তরা রেগে যাবেন। বাদ দিন। আমার মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

মাস তিনেক পর ছেলেটার সঙ্গে আবার দেখা হলো টিভি ভবনে। সে আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল—নাটক লিখছি কি না। আমি সত্যি কথাটা তাকে বলতে পারলাম না। তাকে বললাম, লিখব লিখব। তুমি তৈরি থাকো।

আমি তৈরি আছি। আমি খুব আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছি।

চেহারাটা ঠিক রাখো, চেহারা যেন নষ্ট না হয়।

আমি টিভির আরও কিছু লোকজনের সঙ্গে কথা বললাম। কোনো লাভ হলো না। ছেলেটির সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়। আমি বলি—হবে হবে, ধৈর্য ধরো। এই মিথ্যা আশ্বাস যতবার দিই ততবারই খারাপ লাগে। মনে মনে বলি, কেন বারবার এর সঙ্গে দেখা হয় ? আমি চাই না দেখা হোক। তারপরেও দেখা হয়।

একদিন সে বলল, হুমায়ূন ভাই, আপনি কি একটু তাড়াতাড়ি নাটকটা লিখতে পারবেন ?

কেন বলো তো ?

এমনি বললাম।

হবে হবে, তাড়াতাড়িই হবে।

তারপর অনেক দিন ছেলেটির সঙ্গে দেখা নেই। নাটকের ব্যাপারটা প্রায় ভুলে গেছি। ব্যস্ত হয়ে পড়েছি অন্য কাজে। তখন ১৪০০ সাল নিয়ে খুব হইচই শুরু হলো। আমার মনে হলো, এ-ই হচ্ছে সুযোগ। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নাটকটা লিখে ফেলা যাক। নাটকের নাম হবে '১৪০০ সাল'। প্রথম দৃশ্যে কবি একা একা পদ্মার পাড়ে হাঁটছেন, আবহসংগীত হিসেবে কবির বিখ্যাত কবিতাটি (আজি হতে শতবর্ষ পরে...) পাঠ করা হবে। কবির মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাবে একঝাঁক পাখি। কবি আগ্রহ নিয়ে তাকাবেন পাখির দিকে, তারপর তাকাবেন আকাশের দিকে।

দ্রুত লিখে ফেললাম। আমার ধারণা, খুব ভালো দাঁড়াল। নাটকটা পড়ে শোনালে টিভির যে-কোনো প্রযোজকই আগ্রহী হবেন বলে মনে হলো। একদিন ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করছি টিভি'র বরকতউল্লাহ সাহেবের সঙ্গে। পাশে আছেন জিয়া আনসারী সাহেব। তিনি কথার মাঝখানে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, রবিঠাকুরের ভূমিকায় আপনি যে ছেলেটিকে নেওয়ার কথা ভাবছেন তাকে আমি চিনতে পারছি। গুড চয়েস।

আমি বললাম, ছেলেটার চেহারা অবিকল রবিঠাকুরের মতো না?

হ্যাঁ। তবে ছেলেটিকে আপনি অভিনয়ের জন্যে পাবেন না।

কেন?

ওর লিউকোমিয়া ছিল। অনেক দিন থেকে ভুগছিল। বছরখানিক আগে মারা গেছে।

আমি অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলাম না। গভীর আনন্দ ও আগ্রহ নিয়ে ছেলেটা অপেক্ষা করছিল। তার সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছিল। সে কাউকে তা জানতে দেয় নি।

বাসায় ফিরে নাটকের পাণ্ডুলিপি নষ্ট করে ফেললাম। এই নাটকটি আমি রবিঠাকুরের জন্যে লিখি নি। ছেলেটির জন্যে লিখেছিলাম। সে নেই, নাটকও নেই।

ছেলেটির নাম নিয়ে আমি সমস্যায় পড়েছি। নাম মনে করতে পারছি না। *ভোরের কাগজ*-এর সাংবাদিক জনাব সাজ্জাদ শরিফের ধারণা তার নাম হাফিজুর রশিদ। ডাক নাম রাজু।

নারিকেল-মামা

তাঁর আসল নাম আমার মনে নেই।

আমরা ডাকতাম 'নারিকেল-মামা'। কারণ নারিকেল গাছে উঠে নারিকেল পেড়ে আনার ব্যাপারে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। পায়ে দড়ি-টড়ি কিচ্ছু বাঁধতে হতো না। নিমিষের মধ্যে তিনি উঠে যেতেন। নারিকেল ছিঁড়তেন শুধু হাতে। তাঁর গাছে ওঠা, গাছ থেকে নামা, পুরো ব্যাপারটা ছিল দেখার মতো। তাঁর নৈপুণ্য যে পর্যায়ের তা দেখাবার জন্যই একদিন আমাকে বললেন, এই, পিঠে উঠো। শক্ত কইরা গলা চাইপা ধরো। আমি তা-ই করলাম। তিনি আমাকে নিয়ে তরতর করে নারকেল গাছের মগডালে উঠে দুই হাত ছেড়ে নানা কায়দা দেখাতে লাগলেন। ভয়ে আমার রক্ত জমে গেল। খবর পেয়ে আমার নানাজান ছুটে এলেন। হুংকার দিয়ে বললেন, হারামজাদা, নেমে আয়।

এই হচ্ছেন আমাদের নারিকেল-মামা। আত্মীয়তা সম্পর্ক নেই। নানার বাড়ির সব ছেলেই যেমন মামা, ইনিও মামা। আমার নানার বাড়িতে কামলা খাটেন। নির্বোধ প্রকৃতির মানুষ। খুব গরম পড়লে মাথা খানিকটা এলোমেলো হয়ে যায়। কিংবা কে জানে মাথা হয়তো তাঁর সব সময়ই এলোমেলো। শুধু গরমের সময় অন্যেরা তা বুঝতে পারে।

নারিকেল-মামার মাথা এলোমেলো হওয়ার প্রধান লক্ষণ হলো—হঠাৎ তাঁকে দেখা যাবে গোয়ালঘর থেকে দড়ি বের করে হনহন করে যাচ্ছেন। পথে কারও সঙ্গে দেখা হলো, সে জিজ্ঞেস করল, কই যাস ?

নারিকেল-মামা নির্বিকার ভঙ্গিতে বলবেন, ফাঁস নিব। উঁচা লম্বা একটা গাছ দেইখ্যা ঝুইল্যা পড়ব।

প্রশ্নকর্তা তাতে বিশেষ বিচলিত হয় না। বিচলিত হওয়ার তেমন কারণ নেই। এই দৃশ্য তার কাছে নতুন নয়। আগেও দেখেছে। একবার না, অনেকবার দেখেছে। প্রশ্নকর্তা শুধু বলে, আচ্ছা যা। একবার জিজ্ঞেসও করে না, ফাঁস নেওয়ার ইচ্ছেটা কেন হলো।

তাঁর আত্মহননের ইচ্ছা তুচ্ছ সব কারণে হয়। তাঁকে খেতে দেওয়া হয়েছে। ভাত-তরকারি সবই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু লবণ দিতে ভুলে গেছে। তিনি লবণ চেয়েছেন। যে ভাত দিচ্ছে সে হয়তো শোনে নি। তিনি শান্তমুখে খাওয়া শেষ

করলেন। পানি খেলেন। পান মুখে দিয়ে গোয়ালঘরে ঢুকে গেলেন দড়ির খোঁজে। এই হলো ব্যাপার।

সবই আমার শোনা কথা। আমরা বছরে একবার ছুটির সময় নানার বাড়ি বেড়াতে যেতাম। থাকতাম দশ-পনেরো দিন। এই সময়ের মধ্যে নারিকেল-মামার দড়ি নিয়ে ছোটাছুটির দৃশ্য দেখি নি। তাঁকে আমার মনে হয়েছে অতি ভালো একজন মানুষ। আমাদের মনোরঞ্জনের চেষ্টায় তার কোনো সীমা ছিল না। একটা গল্পই তিনি সম্ভবত জানতেন। সেই গল্পই আমাদের শোনাবার জন্য তাঁর ব্যস্ততার সীমা ছিল না। কাঁইক্যা মাছের গল্প।

এক দিঘিতে একই কাঁইক্যা মাছ বাস করত। সেই দিঘির পাড়ে ছিল একটা চাইলতা গাছ। একদিন কাঁইক্যা মাছ চাইলতা গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছে। হঠাৎ একটা চাইলতা তার গায়ে পড়ল। সে দারুণ বিরক্ত হয়ে বলল, চাইলতারে চাইলতা, তুই যে আমায় মাইলি ?

উত্তরে চাইলতা বলল, কাঁইক্যারে কাঁইক্যা, তুই যে আমার কাছে আইলি ?

এই হলো গল্প। কেনই-বা এটা একটা গল্প, এর মানে কী—আমি কিছুই জানি না। কিন্তু এই গল্প বলতে গিয়ে হাসতে হাসতে নারিকেল-মামার চোখে পানি এসে যেত। আমি তাঁর কাছে এই গল্প বারবার শুনতে চাইতাম তাঁর কাণ্ডকারখানা দেখার জন্যে।

সেবার রোজার ছুটিতে নানার বাড়িতে গিয়েছি। তখন রোজা হতো গরমের সময়। প্রচণ্ড গরম। পুকুরে দাপাদাপি করে অনেকক্ষণ কাটাই। আমরা কেউই সাঁতার জানি না। নারিকেল-মামাকে পুকুরপাড়ে বসিয়ে রাখা হতো যাতে তিনি আমাদের দিকে লক্ষ রাখেন। তিনি চোখ-কান খোলা রেখে মূর্তির মতো বসে থাকেন। একদিন এইভাবে বসে আছেন। আমরা মহানন্দে পানিতে ঝাঁপাচ্ছি, হঠাৎ শুনি বড়দের কোলাহল—ফাঁস নিছে! ফাঁস নিছে!

পানি ছেড়ে উঠে এলাম। নারিকেল-মামা নাকি ফাঁস নিয়েছে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। নানার বাড়িতে পেছনের জঙ্গলে জামগাছের ডালে দড়ি হাতে নারিকেল-মামা বসে আছেন। দড়ির একপ্রান্ত জামগাছের ডালের সঙ্গে বাঁধা। অন্য প্রান্ত তিনি তাঁর গলায় বেঁধেছেন। তিনি ঘোড়ায় চড়ার মতো ডালের দু'দিকে পা দিয়ে বেশ আয়েশ করে বসে আছেন।

আমরা ছোটরা খুব মজা পাচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যে একটা লোক দড়িতে ঝুলে মরবে, সেই দৃশ্য দেখতে পাব—এটা সে সময় আমাদের মধ্যে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। বড়রা অবশ্যি ব্যাপারটাকে মোটেও পাত্তা দিল না। আমার

নানাজান বললেন, আজ গরমটা অতিরিক্ত পড়েছে। মাথায় রক্ত উঠে গেছে। তিনি নারিকেল-মামার দিকে তাকিয়ে বললেন, নাম্‌ হারামজাদা। নারিকেল-মামা বিনীত গলায় বললেন, জে-না মামুজি। ফাঁস দিমু।

তোরে মাইরা আজ হাড্ডি গুঁড়া করব। খেলা পাইছস ? দুইদিন পরে পরে ফাঁস নেওয়া। ফাঁস অত সস্তা। রোজা রাখছস ?

রাখছি।

রোজা রাইখ্যা যে ফাঁস নেওন যায় না এইটা জানস ?

জে-না।

নাইম্যা আয়। ফাঁস নিতে চাস ইফতারের পরে নিবি। অসুবিধা কী ? দড়িও তোর কাছে আছে। জামগাছও আছে। নাম কইলাম। রোজা রাইখ্যা ফাঁস নিতে যায়! কত বড় সাহস। নাম।

নারিকেল-মামা সুড়সড় করে নেমে এলেন। মোটেও দেরি করলেন না। আমাদের মন কী যে খারাপ হলো! মজার একটা দৃশ্য নানাজানের কারণে দেখা হলো না। নানাজানের ওপর রাগে গা জ্বলতে লাগল। মনে ক্ষীণ আশা, ইফতারের পর যদি নারিকেল-মামা আবার ফাঁস নিতে যান।

ইফতারের পরও কিছু হলো না। খাওয়াদাওয়ার পর নারিকেল-মামা হৃষ্টচিত্তে ঘুড়ে বেড়াতে লাগলেন। কোত্থেকে যেন একটা লাটিম জোগাড় করলেন। শহর থেকে আসা বাচ্চাদের খুশি করার জন্যে উঠোনে লাটিম খেলার ব্যবস্থা হলো। আমি একফাঁকে বলেই ফেললাম, মামা, ফাঁস দিবেন না ? তিনি উদাস গলায় বললেন, যাউক, রমজান মাসটা যাউক। এই মাসে ফাঁস নেওয়া ঠিক না।

রমজানের পরে আমরা থাকব না। চলে যাব। আমরা দেখতে পারব না। নারিকেল-মামা উদাস গলায় বললেন, এইসব দেখা ভালো না গো ভাইগ্ন্যা ব্যাটা। জিহ্বা বাইর হইয়া যায়। চউখ বাইর হইয়া যায়। বড়ই ভয়ংকর।

আপনি দেখেছেন ?

ভাইগ্না ব্যাটা কী কয় ? আমি দেখব না! একটা ফাঁসের মরা নিজের হাতে দড়ি কাইট্যা নামাইছি। নামাইয়্যা শইল্যে হাত দিয়ে দেখি তখনো শইল গরম। তখনো জান ভেতরে রইছে। পুরাপুরি কবজ হয় নাই।

হয় নি কেন ?

মেয়েছেলে ছিল। ঠিকমতো ফাঁস নিতে পারে নাই। শাড়ি পেঁচাইয়া কি ফাঁস হয় ? নিয়ম আছে না ? সবকিছুর নিয়ম আছে। লম্বা একটা দড়ি নিবা। যত লম্বা হয় তত ভালো। দড়ির এক মাথা বানবা গাছের ডালে, আরেক মাথা নিজের গলায়। ফাঁস গিট্টু বইল্যা একটা গিঁট্টু আছে। তারপর চউখ বন্ধ কইরা দিবা লাফ।

দড়ি যদি বেশি লম্বা হয় তাহলে তো লাফ দিলে মাটিতে এসে পড়বেন।

মাপমতো দড়ি নিবা। তোমার পা যদি মাটি থাইক্যা এক ইঞ্চি উপরেও থাকে তাইলে হবে। দড়ি লম্বা হইলে নানান দিক দিয়া লাভ। দশের উপকার।

দড়ি লম্বা হলে দশের উপকার কেন তাও নারিকেল-মামা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করলেন।

ফাঁসের দড়ি নানা কাজে লাগে বুঝলা, ভাইগ্না ব্যাটা? এই দড়ি সোনার দড়ির চেয়েও দামি। একটুকরা কাইট্যা যদি কোমরে বাইন্ধ্যা থয় তা হইলে বাত-ব্যাধির আরাম হয়। ঘরের দরজার সামনে একটুকরা বাইন্ধ্যা থুইলে ঘরে চোর-ডাকাত ঢোকে না। এই দড়ি সন্তান প্রসবের সময় খুব কাজে লাগে। ধরো, সন্তান প্রসব হইতেছে না—দড়ি আইন্যা পেটে ছুঁয়াইবা, সঙ্গে সঙ্গে সন্তান খালাস।

সত্যি?

হ্যাঁ। সত্যি। ফাঁসের দড়ি মহামূল্যবান। অনেক ছোট ছোট পুলাপান আছে বিছানায় পেসাব কইরা দেয়। ফাঁসের দড়ি একটুকরা ঘুনসির সঙ্গে বাইন্ধ্যা দিলে আর বিছানায় পেসাব করব না। এইজন্যেই বলতেছি যত লম্বা হয় ফাঁসের দড়ি ততই ভালো। দশজনের উপকার। ফাঁস নিলে পাপ হয়। আবার ফাঁসের দড়ি দশজনের কাজে লাইগ্যা পাপ কাটা যায়। দড়ি যত লম্বা হইব পাপ তত বেশি কাটা যাইব। এইটাই হইল ঘটনা। মৃত্যুর পর পরেই বেহেশতে দাখিল।

নারিকেল-মামার মৃত্যু হয় পরিণত বয়সে। ফাঁস নিয়ে না, বিছানায় শুয়ে। শেষ জীবনে পক্ষাঘাত হয়েছিল, নড়তে-চড়তে পারতেন না। চামচ দিয়ে খাইয়ে দিতে হতো। মৃত্যুর আগে গভীর বিষাদের সঙ্গে বলেছিলেন, আল্লাহপাক আমার কোনো আশা পূরণ করে নাই। ঘর দেয় নাই, সংসার দেয় নাই। কিছুই দেয় নাই। ফাঁস নিয়া মরণের ইচ্ছা ছিল, এইটাও হইল না। বড়ই আফসোস।

আমার বন্ধু সফিক

ইদানীং পুরোনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা হলে বড় ধরনের ধাক্কা খাই। কী চেহারা একেকজনের—দাঁত পড়ে গেছে, গালের চামড়া গেছে কুঁচকে, মাথায় অল্প কিছু ফিনফিনে চুল। কলপ দিয়ে সেই চুলের বয়স কমানো হয়েছে, কিন্তু সাদা সাদা গোড়া উঁকি দিচ্ছে।

ওদের দিকে তাকালে মনে হয়—হায় হায়, আমার এত বয়স হয়ে গেছে? এখন কি তাহলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করব? মিরপুর গোরস্থানে জমি দেখতে যাব?

আয়নায় যখন নিজেকে দেখি তখন এতটা বয়স মনে হয় না। হাস্যকর হলেও সত্যি, নিজেকে যুবক-যুবকই লাগে। ওই তো কী সুন্দর যুবক! চোখের নিচে কালি পড়েছে। এটা এমন কিছু না, রাত জাগি, কালি তো পড়বেই। কয়েক রাত ঠিকমতো ঘুমুতে পারলে চোখের কালি দূর হয়ে যাবে। মুখের চামড়ার বলিরেখা? ও কিছু না। অনেক যুবক ছেলেদের মুখেও এমন দাগ দেখা যায়। মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে? এটা ব্যাপারই না। চুল পাকা বয়সের লক্ষণ নয়। মানুষের যৌবন শরীরে না, মনে।

আমাদের মতো বয়সীদের হঠাৎ রঙিন কাপড়ের দিকে ঝোঁক দেখা যায়। চক্রাবক্রা হাওয়াই শার্ট। এরা তেজি তরুণের মতো হাঁটতে চেষ্টা করে—জরাকে অগ্রাহ্য করার হাস্যকর চেষ্টা। চোখে-মুখে এমন একটা ভাব যেন এইমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পড়া চুকিয়ে রাস্তায় নেমেছে। বান্ধবীকে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই কোনো ক্যাফেতে চা খেতে যাবে কিংবা বাদাম ভাঙতে ভাঙতে হাঁটবে।

এরকম একদিনের কথা। নাপিতের দোকান থেকে চুল কেটে বের হয়েছি। চুল কাটার ফলে গোড়ার সাদা চুল বের হয়ে এসেছে। বিশ্রী দেখাচ্ছে। মেজাজ খারাপ করে এক পান-সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছি। সিগারেট কিনে বাসায় ফিরব। হঠাৎ দেখি যুবক একটা ছেলে কদবেল কিনছে। সে বসেছে উবু হয়ে। বেল শুঁকে শুঁকে দেখছে। তার পেছনেই শাড়িপরা এক তরুণী। তরুণী লজ্জা পাচ্ছে বলে মনে হলো। ছেলেটিকে খুব চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। আবার চিনতেও পারছি না। সে দুটা কদবেল কিনে উঠে দাঁড়াল। আমাকে দেখে চেঁচিয়ে বলল, আরে তুই!

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। এ হচ্ছে আমাদের সফিক। ঢাকা কলেজে এক সঙ্গে পড়েছি, ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি। তারপর যোগাযোগ নষ্ট হয়ে গেছে।

সফিক বলল, তুই এত বিশ্রী করে চুল কেটেছিস! তোকে দেখাচ্ছে পকেটমারের মতো।

আমার হতভম্ব ভাব তখনো কাটে নি। আমি অবাক হয়ে সফিককে দেখছি। ব্যাটার বয়স বাড়ে নি। জরা তাকে স্পর্শ করে নি। তাকে ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র বললে কেউ অবিশ্বাস করবে না।

সফিক বলল, দোস্ত, এ হচ্ছে আমার বড় মেয়ে। ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। এর নাম শাপলা। শাপলা মা, চাচাকে পা ছুঁয়ে সালাম কর।

আমি বললাম, বাজারের মধ্যে কিসের সালাম ?

বাজার-টাজার বুঝি না। সালাম করতে হবে।

মেয়ে একগাদা লোকের মধ্যে নিচু হয়ে সালাম করল। সফিক আমার হাত ধরে বলল, চল আমার সঙ্গে।

কোথায় ?

আমার বাসায়, আবার কোথায় ?

আরে না। চুল কেটেছি—গোসল করব।

কোনো কথা না। শাপলা মা, তুই শক্ত করে চাচার একটা হাত ধর। আমি আরেক হাত ধরছি। দুজনে মিলে টেনে নিয়ে যাব।

আমাকে ওদের সঙ্গে যেতে হলো। ছোট ফ্ল্যাট বাড়ি। বোঝাই যাচ্ছে আর্থিক অবস্থা নড়বড়ে। বসার ঘরে বারো ইঞ্চি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভি। ইদানীং টিভির মাপ থেকে অর্থনৈতিক অবস্থা আঁচ করার একটা সুবিধা হয়েছে। সফিক আমাকে টানতে টানতে একেবারে রান্নাঘরে নিয়ে উপস্থিত—দাঁড়া, বউকে অবাক করে দিই। সে তোর নাটক দেখে গ্যালন গ্যালন পানি ফেলে। চোখের পানির মূল মালিককে ধরে নিয়ে এসেছি।

রান্নাঘরে আমাকে দেখে সফিকের স্ত্রী অত্যন্ত বিব্রত হলো এবং দারুণ অস্বস্তির মধ্যে পড়ল। স্বামীর পাগলামির সঙ্গে বেচারি বোধহয় এত দিনেও মানিয়ে নিতে পারে নি।

ছিঃ ছিঃ কী অবস্থা রান্নাঘরে! এর মধ্যে আপনাকে নিয়ে এসেছে। ওর কোনোদিন কাণ্ডজ্ঞান হবে না। ও কি ছাত্রজীবনেও এরকম ছিল ?

আমি জবাব দিতে পারলাম না। ছাত্রজীবনে সফিক কেমন ছিল আমার মনে নেই। ডিম-সেদ্ধ তার খুব পছন্দের খাবার ছিল—এইটুকু মনে আছে। সিদ্ধ ডিমের খোসা ছাড়িয়ে আস্ত মুখে ঢুকিয়ে দিত। এই সময় তার আরামে চোখ বন্ধ হয়ে যেত।

আমি লক্ষ করলাম, সফিকের বয়স না বাড়লেও তার স্ত্রীর ঠিকই বেড়েছে। ভদ্রমহিলাকে দেখে মনে হয়, জীবনযুদ্ধে তিনি পরাজিত। ক্লান্তি ও হতাশা তাকে পুরোপুরি গ্রাস করেছে। অসুখবিসুখেও মনে হয় ভুগছেন। যতক্ষণ কথা বললেন, ক্রমাগত কাশতে থাকলেন। কাশতে কাশতে বললেন, আপনি এসেছেন আমি খুশি হয়েছি। আপনাকে যে যত্ন-টত্ন করব সেই সামর্থ্য নেই। সংসারের অবস্থা ভাঙা নৌকার মতো। কোনোমতে টেনে নিচ্ছি। ইভিনিং শিফটে একটা স্কুলে কাজ করি। ওই বেতনটাই ভরসা। কাজটা না থাকলে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ভিক্ষা করতে হতো।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, সফিক কিছু করে না?

করে। ও একটা ব্যাংকের ম্যানেজার। তাতে লাভ কিছু নেই। আপনি আপনার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করুন তো—পুরো বেতন কখনো সে আমার হাতে দিয়েছে কি না। এমনও মাস যায় একটা পয়সা আমাদের দেয় না। আপনিই বলুন, আমি কি বাচ্চাগুলোকে পানি খাইয়ে মানুষ করব?

সফিক বলল, চুপ করো। প্রথম দিনেই কী অভিযোগ শুরু করলে। এইসব বলার সুযোগ আরও পাবে। আজ না বললেও চলবে। ফাইন করে চা বানাও। হুমায়ূন খুব চা খায়। সে আগের জন্মে চা-বাগানের কুলি ছিল।

সফিকের স্ত্রী কঠিন গলায় বলল, ভাই, চা আপনাকে খাওয়াচ্ছি, কিন্তু আমার কথা আপনাকে শুনতে হবে এবং আপনার বন্ধুকে বুঝিয়ে বলে যেতে হবে—তার নিজের সংসারটাই আসল। আগে সংসার দেখতে হবে...।

অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, ভদ্রমহিলার চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। বেড়াতে এসে এ কী পারিবারিক সমস্যার মধ্যে পড়লাম! সফিক প্রায় জোর করে তার স্ত্রীকে রান্নাঘরে পাঠিয়ে দিল। আমি বললাম, তোর সমস্যাটা কী?

আরেক দিন বলব।

আজই শুনে যাই।

সফিক খানিকক্ষণ ইতস্তত করে সমস্যা বলা শুরু করল। সফিকের জবানিতেই তার সমস্যা শুনি।

বুঝলি দোস্ত, তখন সবে চাকরি পেয়েছি। বিয়ে-টিয়ে করি নি। নিউ পল্টন লাইনে এক কামরার একটা বাসা নিয়ে থাকি। দেশে টাকা পাঠাতে হয় না। বেতন যা পাই নিজেই খরচ করি। বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে হইচই। এখানে ওখানে বেড়ানো খানিকটা বদঅভ্যাসও হয়ে গেল—মাঝে মধ্যে মদ্যপান করা। বন্ধুবান্ধব এসে ধরে—একটা হুইস্কির বোতল কিনে আন। বেতন পেয়েছিস, সেলিব্রেট কর। কিনে ফেলি। অভ্যাসটা স্থায়ী হলো না, কারণ আমার বডি সিস্টেম অ্যালকোহল সহ্য

করে না। সামান্য খেলেও সারা রাত জেগে থাকতে হয় এবং অবধারিতভাবে শেষরাতে হড়হড় করে বমি হয়।

এক রাতের কথা—সামান্য মদ্যপান করে বাসায় ফিরছি। সামান্যতেই নেশা হয়ে গেছে। একটা রিকশা নিয়েছি। মাথা ঘুরছে। মনে হচ্ছে রিকশা থেকে পড়ে যাব। অনেক কষ্টে হুড ধরে বসে আছি, এমন সময় এক লোক তার ছেলেকে নিয়ে ভিক্ষা চাইতে এল। তার ছেলের চিকিৎসার জন্যে খরচ। আমি ছেলেটিকে দেখে চমকে উঠলাম। সাত-আট বছর বয়স। ফুটফুটে চেহারা। সম্পূর্ণ নগ্ন। নগ্ন থাকার কারণ হলো—তার অসুখের ডিসপ্লে নগ্ন না হলে সম্ভব নয়। ছেলেটির অণ্ডকোষ ফুটবলের মতো প্রকাণ্ড। তাকালেই ঘেন্না হয়। আমি দ্রুত একটা এক শ' টাকার নোট বের করে দিলাম। ছেলের বাবা আনন্দের হাসি হাসল। এই হাসি দেখেই মনে হলো—এই লোক তো ছেলের চিকিৎসা করাবে না। ছেলেকে নিয়ে ভিক্ষা করাই তার পেশা। ছেলে সুস্থ হলে বরং তার সমস্যা।

আমি বললাম, রোজ ভিক্ষা করে কত পাওয়া যায়?

সে গা-ছাড়া ভাব করে বলল, ঠিক নাই। কোনোদিন বেশি, কোনোদিন কম।

আজ কত পেয়েছ? আমারটা বাদ দিয়ে কত?

আছে কিছু।

কিছু-টিছু না। কত পেয়েছ বলো?

লোকটি বলতে চায় না। কেটে পড়তে চায়। আমি তখন নেশাগ্রস্ত। মাথার ঠিক নেই। আমি হুংকার দিলাম, যাচ্ছ কোথায়? এক পা গেছ কি খুন করে ফেলব। বলো আজ কত পেয়েছ?

ধরেন দুই শ'।

তুমি কি এই ছেলেকে চিকিৎসার জন্যে কোনো দিন হাসপাতালে নিয়ে গেছ? বলো ঠিক করে, মিথ্যা বললে খুন করে ফেলব।

সে পুরোপুরি হকচকিয়ে গেল। আমি বললাম, এখনই চলো আমার সঙ্গে হাসপাতালে। মেডিকেল কলেজে আমার এক বন্ধু আছে, ডাক্তার। তাকে দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। বাচ্চা কোলে নিয়ে রিকশায় উঠে আসো।

সে কিছুতেই আমার সঙ্গে যাবে না। আমি নিয়ে যাবই। মাতালদের মাথায় একটা কিছু ঢুকে পড়লে সহজে বের হতে চায় না। আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—চিকিৎসা করাবই। এর মধ্যে আমার চারদিকে লোক জমে গেছে। সবাই আমাকে সমর্থন করছে। লোকটা কাঁদো কাঁদো হয়ে গেছে। সে মিনমিন করে বলল, ডাক্তার অপারেশন করব। অপারেশন করলে আমার পুলা মারা যাইব।

আমি আবারও হুংকার দিলাম, ব্যাটা ফাজিল! ছেলের অসুখের চিকিৎসা করাবে না। অসুখ দিয়ে ফায়দা লুটবে! চলো হাসপাতালে।

অসাধ্য সাধন করলাম। দুপুররাতে এদের হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। বন্ধুকে খুঁজে বের করলাম। সে বিরক্ত হয়ে বলল, এই দুপুররাতে রোগী ভর্তি করব কীভাবে ? তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল ? এই যন্ত্রণা কোথেকে জুটিয়েছিস ?

আমি বললাম, কিচ্ছু শুনতে চাই না। তুই এর ব্যবস্থা করবি। খরচ যা লাগে আমি দিব।

ব্যবস্থা একটা হলো। দেখা গেল, অসুখ তেমন জটিল নয়। খাদ্যনালির অংশবিশেষ মূত্রথলিতে নেমে গেছে। ডাক্তার খাদ্যনালিটা ওপরে তুলে দেবে। মূত্রনালির ফুটো ছোট করে দেবে। অসুখটা হলো খারাপ ধরনের হার্নিয়া।

অপারেশনের তারিখ ঠিক হলো। আমি মহা খুশি। শুধু ছেলের বাবা কেঁদেকেটে অস্থির। তার ধারণা, ছেলে মারা যাচ্ছে। তার একটাই ছেলে। স্ত্রী মারা গেছে। ছেলেকে নিয়ে সে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়। এটাই তার একমাত্র শখ। মনে মনে বললাম, হারামজাদা। ছেলের অসুখ হওয়ায় মজা পেয়ে গেছিস ? দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানো বার করছি। শুওর কা বাচ্চা। ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখ নি। ছেলেকে শুধু যে ভালো করব তাই না, স্কুলেও ভর্তি করাব। মজা বুঝবি।

অপারেশন হয়ে গেল। সাকসেসফুল অপারেশন। ছেলেটিকে অপারেশন টেবিল থেকে ইনটেনসিভ কেয়ারে নেওয়া হলো। আশ্চর্যের ব্যাপার, ইনটেনসিভ কেয়ারে নেওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যে ছেলেটা মারা গেল। আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। হায়, হায়! এ কী সর্বনাশ। আমার কারণে ছেলেটা মারা গেল ? ছেলের বাবার সঙ্গে দেখা করার সাহসও হলো না। আমি হাসপাতাল থেকে পালিয়ে চলে এলাম।

আমি প্রতিজ্ঞা করলাম—আর পরোপকার করতে যাব না। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। সারা রাত একফোঁটা ঘুম হলো না। কেন ছেলেটা মরে গেল ? কেন ?

বুঝলি দোস্ত, ছেলেটা মারা যাওয়ার পর আমার আসল সমস্যা শুরু হলো। আমার রোখ চেপে গেল। ঠিক করলাম—যখন যেখানে অসুস্থ ছেলেপেলে দেখব, চিকিৎসা করাব। দেখি কী হয়। দেখি এরা বাঁচে না মরে। সেই থেকে শুরু। রাস্তায় অসুখবিসুখে কাতর কাউকে দেখলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করি। টাকাপয়সা সব এতেই চলে যায়।

তারপর বিয়ে করলাম। সংসার হলো। অভ্যাসটা গেল না। চিকিৎসার খরচ আছে। আমি বেতনও তো তেমন কিছু পাই না। সংসারে টানাটানি লেগেই

থাকে। বিয়ের সময় তোর ভাবি বেশ কিছু গয়না-টয়না পেয়েছিল। সব বেচে খেয়ে ফেলেছি। এই নিয়েও সংসারে অশান্তি । হা হা হা।

কতজন রোগী এইভাবে সুস্থ করেছিস ?

অনেক।

আর কেউ মারা যায় নি ?

না। আর একজনও না। প্রথমজনই শুধু মারা গেল। আর কেউ না।

এই মুহূর্তে কারও চিকিৎসা করছিস ?

হ্যাঁ, এখনো একজন আছে। জয়দেবপুরের এক মেয়ে। ঠোঁট কাটা। প্লাস্টিক সার্জারি করে ঠোঁট ঠিক করা হবে।

আমি মুগ্ধ গলায় বললাম, তুই যে কত বড় কাজ করছিস সেটা কি তুই জানিস ?

সফিক অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বড় কাজ করছি, না ছোট কাজ করছি তা জানি না। তবে আমার একেকটা রোগী যেদিন সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরে, সেদিন যে আমার কত আনন্দ হয় তা শুধু আমিই জানি। এই আনন্দের কোনো তুলনা নেই। প্রতিবারই আমি আনন্দ সামলাতে না পেরে হাউমাউ করে কাঁদি। লোকজন, ডাক্তার, সবার সামনেই কাঁদি।

বলতে বলতে সফিকের চোখে পানি এসে গেল। পানি মুছে সে স্বাভাবিক গলায় বলল, তারপর দোস্ত, তোর খবর বল। তুই কেমন আছিস ?

আমি মনে মনে বললাম, শারীরিকভাবে আমি ভালো আছি। কিন্তু আমার মনটা অসুস্থ হয়ে আছে। তুই আমার মন সুস্থ করে দে। এই ক্ষমতা অল্প কিছু সৌভাগ্যবানের থাকে। তুই তাদের একজন।

শিকড়

মাসের শেষ সপ্তাহে ঢাকা শহরে খাট, মিটসেফ, চেয়ার-টেবিল এবং লেপ-তোষক বোঝাই করে কিছু ঠেলাগাড়ি চলাচল করে। ঠেলাগাড়ির পেছনে পেছনে একটা রিকশায় বসে থাকেন এইসব মালামালের মালিক। তাঁর কোলে থাকে চাদরে মোড়া বারো ইঞ্চি ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টিভি কিংবা টু-ইন-ওয়ান। তাঁকে খুবই ক্লান্ত ও উদ্বিগ্ন মনে হয়, কারণ একইসঙ্গে তাঁকে লক্ষ রাখতে হচ্ছে ঠেলাগাড়ির দিকে এবং তাঁর কোলে বসানো পরিবারের সবচেয়ে মূল্যবান সামগ্রীটির দিকে। তাঁকে খুব অসহায়ও মনে হয়। অসহায়, কারণ এই মুহূর্তে তাঁর কোনো শিকড় নেই। শিকড় গেড়ে কোথাও না বসা পর্যন্ত তার অসহায় ভাব দূর হবে না।

মানুষের সঙ্গে গাছের অনেক মিল আছে। সবচেয়ে বড় মিল হলো, গাছের মতো মানুষেরও শিকড় আছে। শিকড় উপড়ে ফেললে গাছের মৃত্যু হয়, মানুষেরও এক ধরনের মৃত্যু হয়। মানুষের নিয়তি হচ্ছে তাকে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্যুর ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয় চূড়ান্ত মৃত্যুর দিকে।

শিকড় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে অনেক কিছু লাগে— নরম মাটি, পানি, আলো, হাওয়া। মানুষের কিছুই লাগে না। কয়েকটা দিন একটা জায়গায় থাকতে পারলেই হলো, সে শিকড় গজিয়ে ফেলবে এবং অবধারিতভাবে শিকড় উপড়ানোর তীব্র যাতনায় একসময় কাতর হবে। দৃশ্যটা কেমন ? একটা পরিবারের কথাই মনে করা যাক। ধরা যাক, এরা চার-পাঁচ বছর একটা ভাড়া বাড়িতে থেকেছে। বাড়িওয়ালা, বাড়িওয়ালাদের স্বভাবমতো এদের নানাভাবে যন্ত্রণা দিয়েছে। ঠিকমতো পানি দেয় নি। বাড়িভাড়া বাড়িয়েছে দফায় দফায়, শেষপর্যন্ত নোটিশ দিয়েছে বাড়ি ছাড়ার। এরা বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে। নতুন একটা বাড়ি পেয়েছে, যেটা এই বাড়ির চেয়েও সুন্দর। ভাড়া কম, সামনে খানিকটা খোলা জায়গাও আছে। পরিবারের সবাই এমন ভাব দেখাচ্ছে যে, এই পচা বাড়ি ছেড়ে দিতে পেরে তারা খুবই আনন্দিত। কিন্তু পরিবারের কর্ত্রী মনের কষ্ট পুরোপুরি ঢাকতে পারছেন না। বারবার তার মনে হচ্ছে, এই বাড়ি ঘিরে তার কত আনন্দ-বেদনার স্মৃতি।

তাঁর বড় ছেলের জন্ম হলো এই বাড়িতে। এই বাড়িতেই তো সে হাঁটতে শিখল। টুকটুক করে হাঁটত, একবার সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়ে কী প্রচণ্ড ব্যথাই না পেল।

প্রথম কথা শিখে পাখি দেখে উত্তেজিত গলায় বলেছিল, পা...পা...পা...।

তিনি বাঁধাছাঁদা করছেন, পুরোনো সব কথা মনে পড়ছে আর চোখ মুছছেন। জিনিসপত্র সরাতে গিয়ে বাবুর ছ' মাস বয়সের একটি জুতা পেয়ে গেলেন। বাবু বেঁচে নেই, তার সব জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মৃতের কিছু জমা করে রাখতে নেই। কিন্তু তার একপাটি জুতা কীভাবে থেকে গেল ? এই জুতায় এখনো বাবুর গায়ের গন্ধ।

তিনি ঘর গোছানো বন্ধ রেখে স্বামীকে নিচু গলায় বললেন, কিছু বেশি ভাড়া দিয়ে থেকে গেলে কেমন হয় ? স্বামী খুব রাগ করলেন। কী আছে এই বাড়িতে যে এখানেই থাকতে হবে ? এর বাড়ি নরক ছাড়া আর কী ? নচ্ছার বাড়িওয়ালা। বাসা ছোট। আলো নেই, বাতাস নেই।

যেদিন বাসা বদল হবে সেদিন ছোট বাচ্চা দুটা কাঁদতে লাগল। তারা এই বাসা ছেড়ে যাবে না। বাবা হুংকার দিলেন, খবরদার, নাকি কান্না না। এরচেয়ে হাজার গুণ ভালো বাসায় তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি।

বাবা জিনিসপত্র ঠেলাগাড়িতে তুলে বাসার চাবি বাড়িওয়ালাকে দিতে গেলেন। চাবি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বাড়িতে তাঁর প্রোথিত শিকড় ছিঁড়ে গেল। তীব্র কষ্টে তিনি অভিভূত হলেন। তাঁর চোখে পানি এসে গেল। নতুন বাসার জন্যে অ্যাডভান্স টাকা দেওয়া হয়ে গেছে। তাঁর মতো দরিদ্র মানুষের জন্যে অনেকগুলো টাকা। তারপরেও তিনি বাড়িওয়ালাকে বললেন, ভাই সাহেব, ছেলেমেয়েরা এই বাসা ছাড়তে চাচ্ছে না। চারদিকে পরিচিত বন্ধুবান্ধব তো...আচ্ছা না হয় পাঁচ শ' টাকা বেশিই দেব...। তা ছাড়া ইয়ে, মানে আমার বড় ছেলে এই বাড়িতেই জন্মাল, আমার স্ত্রী মানে মেয়েমানুষ তো, ইমোশন বুঝতেই পারছেন...ছেলের স্মৃতি...।

বাড়িওয়ালা রাজি হলেন না। বাবা ভেজা চোখে ছোট টিভিটা কোলে নিয়ে রিকশায় উঠে বসলেন।

অনেক দিন ধরেই আমি এই শহরে আছি। কতবার বাসা বদলালাম। প্রতিবারই এই কাণ্ড। বছরখানিক আগে শহীদুল্লাহ হলের হাউজ টিউটরের বাসাটা ছাড়লাম। অনেক দিন সেখানে ছিলাম। কত সুখস্মৃতি। বাসার সামনে গাছগাছালিতে ছাওয়া। গাছে বাসা বেঁধেছে টিয়া। একটি দুটি না—হাজার হাজার। বারান্দায় বসে দেখতাম, সন্ধ্যা হলেই ঝাঁক ঝাঁক টিয়া উড়ত। আমার মেয়েরা গাছের নিচে ঘুরঘুর করত টিয়া পাখির পালকের জন্যে। এরা পাখির পালক জমাত।

হলের সঙ্গেই কী বিশাল দিঘি! কী পরিষ্কার টলমলে পানি! বাঁধানো ঘাট। কত জোছনার ফিনকি ফোটা রাতে আমি আমার ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীকে নিয়ে

নেমে গেছি দিঘিতে। এই দিঘিতেই তো বড় মেয়েকে সাঁতার শেখালাম। প্রথম সাঁতার শিখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে আমার মেয়ে একা একা মাঝপুকুরের দিকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আবার ভয় পেয়ে ফিরে এল। কী সুন্দর দৃশ্য।

হলের সামনের মাঠে আমার তিন কন্যা সাইকেল চালাতে শিখল, আমি তাদের ইন্সট্রাক্টর। সাইকেলে প্রথমবারের মতো নিজে নিজে কিছু দূর এগিয়ে যাওয়ার আনন্দের কি কোনো সীমা আছে? না, নেই। এই আনন্দ আকাশ থেকে প্যারাট্রুপারে প্রথম ঝাঁপ দেওয়ার আনন্দের মতো। আমার কন্যাদের আনন্দের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই হল।

হলের বাসার টানা বারান্দায় বসে রাত জেগে কত লেখালেখি করেছি! গুলির শব্দে মাঝে মাঝে লেখায় যেমন বাধা পড়েছে, তেমনি অন্যরকম ব্যাপারও ঘটেছে। হঠাৎ শোনা গেল—বাঁশি বাজছে। কাঁচা হাতের বাজনা, বড়ই সুন্দর হাত। লেখালেখি বন্ধ করে বাঁশি শুনেছি।

আমার হলের নিশিরাতের সেই বংশীবাদক জানে না আমি কত আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতাম তার বাঁশির জন্যে। সে ভালো থাকুক, তার জীবন মঙ্গলময় হোক—এই প্রার্থনা। কত আনন্দ পেয়েছি তার জন্যে।

সেই হল ছেড়ে দেওয়ার সময় হলো। বহুদূর প্রোথিত এই শিকড় ছিঁড়তে হবে।

কী কষ্ট! কী কষ্ট!

ঠিক করলাম, একদিনে হল ছেড়ে যাব না। ধীরে ধীরে যাব। প্রথম দিন হয়তো বইগুলো নেওয়া হবে, দ্বিতীয় দিনে শুধু চেয়ার, তৃতীয় দিনে ফুলের টব... এইভাবে এক মাসের পরিকল্পনা। বোঝাও যাবে না আমরা হল ছাড়ছি। করাও হলো তা-ই। বাচ্চাদের আগে আগে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। আমি এবং আমার স্ত্রী হল ছাড়লাম গভীর রাতে।

শেষবারের মতো শূন্যঘরে দাঁড়িয়েছি। ছোট বাচ্চাদের মতো ফুঁপিয়ে কাঁদছি, গুলতেকিন বলল, তোমার যখন এত খারাপ লাগছে তখন হল ছেড়ে দিচ্ছ কেন? থেকে যাও।

থেকে যাও বললেই থেকে যাওয়া যায় না। প্রোথিত শিকড় ছিঁড়তে হয়। হয়তো এই শিকড় ছেঁড়ার মধ্য দিয়েই কেউ-একজন আমাদের আসল শিকড় ছেঁড়ার কথা মনে করিয়ে দেন...।

তিনি

রাত ন'টার মতো বাজে। আমি কী যেন লিখছি। হঠাৎ আমার মেজো মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে বলল, বাবা, খুব বিখ্যাত মানুষ তোমাকে টেলিফোন করেছেন।

আমি দেখলাম আমার মেয়ের মুখ উত্তেজনায় চকচক করছে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। বিখ্যাত মানুষেরা যে আমাকে একেবারেই টেলিফোন করেন না তা তো না। মেয়ে এত উত্তেজিত কেন?

বাবা তুমি কিন্তু আবার বলতে বলবে না যে তুমি বাসায় নেই। তোমার বিশ্রী অভ্যাস আছে—বাসায় থেকেও বলো বাসায় নেই।

আমি বললাম, টেলিফোন কে করেছে মা?

আমার মেয়ে ফিসফিস করে বলল, জাহানারা ইমাম।

এই নাম ফিসফিস করে বলছ কেন? ফিসফিস করার কী হলো?

বাবা, উনি যখন বললেন তাঁর নাম জাহানারা ইমাম তখন আমি এতই নার্ভাস হয়ে গেছি যে, তাঁকে স্লামালিকুম বলতে ভুলে গেছি।

বিরাট ভুল হয়েছে। যাই হোক দেখা যাক কী করা যায়।

আমি টেলিফোন ধরলাম এবং বললাম, আমার মেয়ে আপনাকে সালাম দিতে ভুলে গেছে এইজন্যে সে খুব লজ্জিত। আপনি তাকে ক্ষমা করে দেবেন। সে আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে।

ওপাশ থেকে তাঁর হাসির শব্দ শুনলাম। হাসতে হাসতেই বললেন, আমি কিন্তু আপনাকে টেলিফোন করেছি কিছু কঠিন কথা বলার জন্যে।

বলুন।

আপনি রাগ করুন বা না করুন, কথাগুলো আমাকে বলতেই হবে।

আমি শংকিত হয়ে আপনার কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছি।

আপনি স্বাধীনতাবিরোধীদের পত্রিকায় লেখেন কেন? আপনার মতো আরও অনেকেই এই কাজটি করে। কিন্তু আপনি কেন করবেন?

তিনি কথা বলছেন নিচু গলায়। কিন্তু বলার ভঙ্গিতে কোনো অস্পষ্টতা নেই। কোনো আড়ষ্টতা নেই।

আমি হকচকিয়ে গেলাম। আক্রমণ এইদিক থেকে আসবে ভাবি নি। তবে পত্রিকায় লেখা দেওয়ার ব্যাপারে আমার কিছু যুক্তি আছে। খুব যে দুর্বল যুক্তি

তাও না। যুক্তিগুলো তাঁকে শোনালাম। মনে হলো এতে তিনি আরও রেগে গেলেন। কঠিন গলায় বললেন, আপনার মিসির আলি-বিষয়ক রচনা আমি কিছু কিছু পড়ছি, আপনি যুক্তি ভালো দেবেন তা জানি। কিন্তু আমি আপনার কাছ থেকে যুক্তি শুনতে চাচ্ছি না। আপনাকে কথা দিতে হবে ওদের পত্রিকায় লিখে ওদের হাত শক্তিশালী করবেন না। আপনি একজন শহীদ পিতার পুত্র। 'তুই রাজাকার' স্লোগান আপনার কলম থেকে বের হয়েছে। বলুন আর লিখবেন না!

আমি সহজে প্রভাবিত হই না। সে রাতে হলাম। বলতে বাধ্য হলাম, আপনাকে কথা দিচ্ছি আর লিখব না। এখন বলুন আপনার রাগ কি কমেছে? তিনি হেসে ফেললেন। বাচ্চামেয়েদের এক ধরনের হাসি আছে—কুটকুট হাসি, বড়দের বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে যে হাসিটা তারা হাসে সেই হাসি।

আমি বললাম, আমি সব সময় লক্ষ করেছি আপনি আমাকে আপনি আপনি করে বলেন। নিজেকে খুব দূরের মানুষ মনে হয়। দয়া করে আমাকে তুমি করে বলবেন। তিনি বললেন, আচ্ছা বলব। এখন থেকে বলব।

তিনি কিন্তু আমাকে 'তুমি' কখনোই বলেন নি। যতবারই মনে করিয়ে দিয়েছি ততবারই বলেছেন, হ্যাঁ এখন থেকে বলব। কিন্তু বলার সময় বলেছেন 'আপনি'। হয়তো আমাকে তিনি কখনোই কাছের মানুষ মনে করেন নি।

তাঁর অনেক কাছের মানুষ ছিল আমার মা। আমার ছোটভাই জাফর ইকবাল। জাফর ইকবালের উল্লেখ তাঁর লেখাতে পাই। ব্যক্তিগত আলাপেও জাফর ইকবালের প্রসঙ্গে তাঁকে উচ্ছ্বসিত হতে দেখি। শুধু আমার ব্যাপারেই এক ধরনের শীতলতা। হয়তো তাঁর ধারণা হয়েছিল, যে মহান আন্দোলনের নেতৃত্ব তিনি দিচ্ছেন আমি সেই আন্দোলন এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছি। যে ১০১জনকে নিয়ে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আদি যাত্রা, আমি সেই ১০১জনের একজন। অথচ পরে আমার আর কোনো খোঁজ নেই। কাজেই আমার ভূমিকায় অস্পষ্টতা তো আছেই। তিনি আমার প্রতি শীতলভাব পোষণ করতেই পারেন। সেটাই স্বাভাবিক।

আরেক দিনের কথা, তিনি টেলিফোন করেছেন। গলার স্বর অস্পষ্ট। কথা কেমন জড়িয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, আপনার শরীর খারাপ?

তিনি ক্লান্ত গলায় বললেন, শরীর আছে শরীরের মতোই। আপনাকে একটা ব্যাপারে টেলিফোন করেছি।

বলুন কী ব্যাপার।

এই যে একটা আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এতে অর্থ ব্যয় হচ্ছে। আমাকে চলতে হচ্ছে মানুষের চাঁদায়। আপনি প্রতি মাসে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের চাঁদা দেবেন

অবশ্যই দেব।

আমি একজনকে পাঠাচ্ছি। এ মাসের চাঁদা দিয়ে দিন।

জি আচ্ছা। কত করে দেব ?

আপনি আপনার সামর্থ্যমতো দেবেন। মাসে দু' হাজার করে দিতে পারবেন ?

পারব।

একজন এসে চাঁদা নিয়ে গেল। পরের দু' মাস কেউ চাঁদা নিতে এল না। আমার একটু মন খারাপ হলো। মনে হলো হয়তো সিদ্ধান্ত হয়েছে আমার কাছ থেকে চাঁদা নেওয়া হবে না। তৃতীয় মাসে তিনি টেলিফোন করে বললেন, কী ব্যাপার, আপনি আপনার চাঁদার টাকা দিচ্ছেন না কেন ?

আমি বিনীতভাবে বললাম, কেউ তো নিতে আসে নি।

আমার এত লোকজন কোথায় যে পাঠাব! আপনি নিজে এসে দিয়ে যেতে পারেন না ? আপনি তো এলিফ্যান্ট রোডেই থাকেন। দু' মিনিটের পথ।

আমি আসছি। ভালো কথা, আপনার সঙ্গে রাগারাগি করার মতো একটা ঘটনা ঘটেছে। আমি এসেই কিন্তু রাগারাগি করব।

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

এসে নেই, তারপর বুঝবেন।

না, এখন বলুন।

আমার বড় মেয়ে নোভার ছিল মাথাভর্তি চুল। আপনি হচ্ছেন তার আদর্শ। আপনার মাথার ছোট ছোট চুল তার খুব পছন্দ। সে আপনার মতো হওয়ার প্রথম ধাপ হিসেবে তার মাথার সব চুল কেটে ফেলেছে।

সত্যি ?

বাসায় আসুন। বাসায় এসে দেখে যান।

একেবারে কিশোরী গলায় তিনি অনেকক্ষণ হাসলেন। তারপর বললেন, আপনার মেয়েকে বলবেন লম্বা চুল আমার খুব প্রিয়। আমি যখন ওর বয়সী ছিলাম, তখন আমার হাঁটু পর্যন্ত লম্বা চুল ছিল। ছবি আছে। আমি আপনার মেয়েকে ছবি দেখাব। চুল কেটে ছোট করতে হয়েছে ক্যানসারের জন্যে। কেমোথেরাপির কারণে চুল পড়ে যাচ্ছিল। কী আর করব!

তিনি একবার আমার বাসায় আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমার মেয়েদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করবেন। তাঁর গল্প করতে ইচ্ছা করছে। গাড়ি পাঠিয়ে তাঁকে আনালাম। বাসায় আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। গ্রহ যেমন সূর্যকে ঘিরে রাখে আমার মেয়েরাও তাঁকে সেইভাবে ঘিরে গোল হয়ে বসে পড়ল। তিনি তাদের বললেন

তাঁর শৈশবের কথা। আমি আসরে যোগ দিতে চেয়েছিলাম। তিনি বললেন, আপনি আসবেন না। এই আসরে আপনার প্রবেশাধিকার নেই।

অন্যান্য ফ্ল্যাটে খবর চলে গেছে। ছেলেমেয়েরা আসছে। তারাও গল্প শুনতে চায়। আমার স্ত্রী ব্যস্ত হয়ে পড়ল, অতি সম্মানিত এই মানুষটিকে সে কী খাওয়াবে! তিনি তো কিছুই খেতে পারেন না।

তিনি আমার স্ত্রীকে আশ্বস্ত করলেন, শুধু মুখে যাবেন না। কিছু খাবেন। পাকা পেঁপে থাকলে ভালো হয়।

ঘরে পাকা পেঁপে নেই। আমি ছুটলাম পাকা পেঁপের সন্ধানে। লিফট থেকে নামতেই এক ভদ্রলোক চোখ বড় বড় করে বললেন, জানেন, আমাদের এই বাড়ির কোন-এক ফ্ল্যাটে জাহানারা ইমাম এসেছেন।

আনন্দে আমার মন দ্রবীভূত হলো। এই মহীয়সী নারী কত অল্প সময়ে মানুষের হৃদয় দখল করে নিয়েছেন।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ আমাকে দেন আসাদুজ্জামান নূর।

বাসায় তখন ক্যাসেট প্লেয়ার বাজছে। আমার মেয়েরা জন ডেনভারের গান শুনছে 'রকি মাউন্টেন হাই, কলারডো।' সঙ্গে সঙ্গে গান বন্ধ হয়ে গেল। মেয়েরা তাদের নিজেদের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। আমার মা আমার কাছে জানতে চাইলেন, আন্দোলন এখন কে এগিয়ে নিয়ে যাবে? আমি তাঁকে বললাম, দ্বিতীয় জাহানারা ইমাম আমাদের নেই। জাহানারা ইমাম দুটা তিনটা করে জন্মায় না। একটাই জন্মায়। তবে কেউ-না-কেউ এগিয়ে আসবেই। অপেক্ষা করুন।

মা জায়নামাজে বসলেন।

আর আমি একা একা বসে রইলাম বারান্দায়। এক ধরনের শূন্যতাবোধ আমার ভেতর জমা হতে থাকল। কেবলই মনে হতে লাগল, একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে। কী পরিমাণ শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা এই মানুষটির প্রতি আমার ছিল তা তাঁকে জানানো হয় নি। আমার একটাই সান্ত্বনা, মৃত্যুর ওপাশের জগৎ থেকে আজ তিনি নিশ্চয়ই আমার বিপুল শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অনুভব করতে পারছেন। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি সব সময়ই তাঁর পাশে ছিলাম। যে ক'দিন বেঁচে থাকব তা-ই থাকব। বঙ্গজননীর পাশে তাঁর সন্তানরা থাকবে না, তা কি কখনো হয়?

বাংলার পবিত্র মাটিতে তাঁর পায়ের চিহ্ন আর পড়বে না। স্বাধীনতাবিরোধীদের এই সংবাদে উল্লসিত হওয়ার কিছু নেই। বাংলার হৃদয়ে তিনি জ্বেলে দিয়েছেন অনির্বাণ শিখা। ঝড়ঝাপটা যত প্রচণ্ডই হোক না কেন সেই শিখা জ্বলতেই থাকবে। কী সৌভাগ্য আমাদের, তিনি জন্মেছিলেন এই দেশে।

একদিন চলিয়া যাব

আমার বড় মামা খুব অসুস্থ। মৃত্যুশয্যা পেতেছেন। তিনি শেষ বারের মতো তাঁর সব প্রিয়জনকে দেখতে চান, এই খবর পেয়ে আমি ছুটে গেলাম নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে। মামার সঙ্গে দেখা হলো না। আমি পৌঁছালাম বিকেলে, তিনি মারা গেলেন সেইদিন সকালে। মৃত্যুশোকে পাথর হয়ে আছে আমার নানার বাড়ি। গিজগিজ করছে মানুষ। মেয়েরা সুর করে কাঁদছে। মাদ্রাসার তালেবুল এলেমরা চলে এসেছে—তারা কোরানপাঠ শুরু করেছে।

আমি প্রচণ্ড শোকেও চাপা এক উৎসবের ছোঁয়া পেলাম। বড় কোনো উৎসবের আগে যে উত্তেজনা থাকে, যে ব্যস্ততা থাকে—এখানেও তাই। মুরব্বিরা উঠোনে গোল হয়ে বসে আছেন। তাঁরা গম্ভীর মুখে তামাক টানছেন। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তাঁদের কাছ থেকে আসছে। মরা বাড়িতে তিন দিন আগুন জ্বলবে না। খাবার আসবে বাইরে থেকে। এই খাবারের নাম তোলা খাবার। কোন কোন বাড়ি থেকে এই খাবার আসবে তার তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। তোলা খাবার সবাই পাঠাতে চায়। কিন্তু সবার খাবার নেওয়া যাবে না। সামাজিক মানমর্যাদার ব্যাপার আছে।

খান সাহেবের বাড়ি থেকে একবেলা তোলা খাবার পাঠানোর প্রস্তাব এসেছে। এই প্রস্তাবে সবাই বিব্রত। এই প্রস্তাব গ্রহণ করা যাচ্ছে না, আবার তাঁদের 'না' বলাও যাচ্ছে না। তাঁরা ক্ষমতাশালী। এই ভয়াবহ (!) সমস্যার সমাধান বের করার জন্যে মুরব্বিরা নিচু গলায় ক্রমাগত কথা বলে যাচ্ছেন। তামাক পুড়ছে প্রচুর।

মুরব্বিদের দ্বিতীয় দল (এরা অনেক বয়স্ক। এদের কেউ কেউ অথর্ব পর্যায়ে চলে গেছেন। চলচ্ছক্তি নেই, চোখে দেখেন না—এমন) অন্য সমস্যা নিয়ে বসেছেন—কে গোসল দেওয়াবে ? মড়ার গায়ে এক বালতি পানি ঢেলে দিলে তো হবে না। জটিল নিয়মকানুন আছে। সবাই এইসব নিয়ম জানে না। যে জানে তাকে দিয়ে গোসল দেওয়ানো যাবে না, কারণ সে 'শরাব' খায়—এরকম গুজব সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে। মুরব্বিদের একজন বললেন, আচ্ছা ফজলু কি মৃত্যুর আগে কিছু বলেছে—কে তারে গোসল দিবে ? বা কবর কোনখানে হবে ?

না, বলে নাই।

বলে গেলে কাজকর্মের সুবিধা হয়। বলে যাওয়া উচিত।

মৃতের ওপর রাগ করা যায় না, তবে মৃতের বোকামির জন্যে কিঞ্চিৎ বিরক্ত হওয়া যায়।

ভেতরবাড়ি থেকে মেয়েরা চিৎকার করে কাঁদছে। এত উঁচু স্বরে বিলাপ শরিয়তে নিষেধ করা হয়েছে। তাদের গলা নিচু করতে বলা হলো। তালেবুল এলেমরা কোরানশরিফ এত 'মাধা' গলায় পড়ছে কেন ? গলায় জোর নাই ? তাদের মৃদু ধমক দেওয়া হলো।

আত্মীয়স্বজন সবাই কি খবর পেয়েছে ? ভুলক্রমে কাউকে খবর না দেওয়া হলে বিরাট জটিলতা হবে। যাদের খবর দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে কারা কারা উপস্থিত হয়েছে ? সবাই উপস্থিত না হলে জানাজার সময় ঠিক করা যাবে না।

কবর দিয়ে দিতে হবে আসরের নামাজের পর পর। দেরি করা যাবে না। কবর দিতে দিতে মাগরেবের নামাজের সময় হয়ে যাবে। মসজিদে মাগরেবের নামাজ আদায় করে গোরযাত্রীরা ঘরে ফিরবে।

কবরের জায়গা কি ঠিক হয়েছে ?

হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। বাড়ির পেছনে। গোরস্থানে কবর হলে মেয়েছেলারা যেতে পারে না। মৃত ছেলের মা ছেলের কবর ঘরের পাশে চাচ্ছেন, যাতে তিনি যখন তখন যেতে পারেন।

মসজিদের লাগোয়া গোরস্থানে কবর হলেই ভালো হতো। তবু মা'র ইচ্ছাই বড়। বাড়ির পেছনে কবর খননের অনুমতি দেওয়া হলো। তখনই আসল সমস্যা দেখা দিল। যে কবর খুঁড়বে সে নেই। সে গিয়েছে শম্ভুগঞ্জ, তার মেয়ের বাড়ি। কী সর্বনাশ! শম্ভুগঞ্জ থেকে তাকে ধরে আনার জন্য তৎক্ষণাৎ লোক ছুটল। মনে হচ্ছে বাদ-আছর কবর হবে না। বিলম্ব হবে। উপায় কী ? আল্লা আল্লা করে ওই লোককে পাওয়া গেলে হয়।

আমি ভেবে পেলাম না, মোহনগঞ্জের মতো এত বড় একটা জায়গায় কবর খোঁড়ার কি একজনই মানুষ ? আমার অজ্ঞতায় সবাই মজা পেলেন। আমাকে জানানো হলো, জামাল উদ্দিন কবর খোঁড়ার ব্যাপারে অঞ্চল-বিখ্যাত। তার মতো সুন্দর করে কেউ কবর খুঁড়তে পারে না। তাকে না পাওয়া গেলে এক কথা। পাওয়ার সম্ভাবনা যখন আছে চেষ্টা করা যাক।

আমি নিচু গলায় বললাম, কবর খোঁড়ার মধ্যে সুন্দর-অসুন্দর কী আছে ?

আমার নির্বুদ্ধিতায় আবারও সবাই বিরক্ত হলেন।

মানুষের আসল বাড়ি কবর। সেই বাড়িটা সুন্দর করে বানাতে হবে না ? দালানকোঠা সুন্দর করে বানিয়ে ফয়দা কী ?

জালালউদ্দিন এসে পৌঁছালেন রাত দশটায়। রোগা পাতলা মধ্যবয়স্ক একজন মানুষ। পানের ব্যবসা করেন। তুচ্ছ ধরনের ব্যবসা। কেউ তাকে পোছে না। কিন্তু কারও মৃত্যু হলে সবাই তাঁর জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। জালাল উদ্দিনকে লাগবে। যেখান থেকে পারো তাকে ধরে আনো।

তিনটা হ্যাজাক লাইট জ্বালিয়ে কবর খোঁড়া শুরু হলো। আমি গভীর আগ্রহে কবর খোঁড়া দেখছি। জালাল উদ্দিন মাটি কুপিয়ে কুপিয়ে তুলছেন। মনে হচ্ছে কাজটায় তিনি আনন্দ পাচ্ছেন। একসময় মুখ তুলে হাসিমুখে বললেন, ফজলুর ভাগ্য ভালো। মাটি ভালো পাইছি। সচরাচর এমন ভালো মাটি পাওয়া যায় না।

মেয়েদের মধ্যে কে যেন এদিকে এসে পড়ল। তাকে প্রচণ্ড ধমক দেওয়া হলো।

মেয়েদের কবর খোঁড়া দেখতে নেই। এটা পুরুষদের কাজ। কবর খোঁড়া শেষ হলো রাত একটায়। জালাল উদ্দিন তাঁর কাজ শেষ করে উঠে পড়লেন। হ্যাজাকের আলো ফেলা হলো কবরে। আমি স্বীকার করতে বাধ্য হলাম—এটা সামান্য গর্তবিশেষ নয়। এ এক শিল্পকর্ম। পৃথিবীর অন্যান্য শিল্পকর্মের মতো এই শিল্পকর্মের দিকেও মুগ্ধ হয়ে তাকানো যেতে পারে।

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন বলল, ফজলুর ভাগ্য আসলেই ভালো। কবরটা যেন হাসতেছে।

আমি বললাম, আমি একটু কবরে নেমে দেখতে চাই।

কেউ কোনো আপত্তি করল না। শুধু বলা হলো যেন অজু করে নামা হয়। আমি অজু করে কবরে নেমেছি। আমার চারদিকে মাটির দেয়াল। যারা ওপরে আছে তাদের কথা পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি না। হঠাৎ আমার মনে হলো, আমাকে যেন আলাদা করে ফেলা হয়েছে—এই পৃথিবী, এই অনন্ত নক্ষত্রবীথির সঙ্গে আর আমার কোনো যোগ নেই।

জীবনে কোনো বড় ধরনের অতিপ্রাকৃত অনুভূতির মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। সেই মধ্যরাত্রের বিচিত্র অভিজ্ঞতাই প্রথম এবং এ পর্যন্ত শেষ অভিজ্ঞতা।

মৃত্যু

তাঁর পেটে ক্যানসার। দু'বার অপারেশন হয়েছে। প্রথমবার দেশে, দ্বিতীয়বার কলকাতায়। লাভ কিছু হলো না। অবস্থা আরও খারাপ হতে লাগল। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো ব্যাংককের আমেরিকান হাসপাতালে। সেখানকার চিকিৎসা নাকি ভালো। অনেক সময় এমন হয়েছে, দেশের ডাক্তাররা বলেছেন ক্যানসার; ওখানে গিয়ে দেখা গেছে অন্য কিছু।

তিনিও হয়তো তেমন কিছু আশা করছিলেন। কিন্তু ব্যাংককের ডাক্তাররা বিনয়ের সঙ্গে বললেন, রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। এখন শুধু যন্ত্রণা কমানোর চেষ্টাই করা যাবে। আর কিছু না।

তিনি হতভম্ব হয়ে ডাক্তারদের কথা শুনলেন। পাশে দাঁড়ানো তাঁর বড় ছেলের দিকে তাকিয়ে নেত্রকোনার ডায়ালেক্টে বললেন, নাকচেপ্টা ডাক্তার, এইতা কী কয়?

ছেলে বলল, বাবা, তুমি কোনো চিন্তা করবে না। আমি তোমাকে আমেরিকায় নিয়ে যাব। যে চিকিৎসা কোথাও নেই—সেই চিকিৎসা আমেরিকায় আছে।

তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, গাধার মতো কথা বলিস না। আমেরিকার মানুষ বুঝি ক্যানসারে মরে না? চল দেশে যাই। মরণের জন্য তৈয়ার হই।

ভদ্রলোক মৃত্যুর প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন।

গল্প-উপন্যাসে এরকম চরিত্র পাওয়া যায়। অমোঘ মৃত্যুর সামনেও দেখা যায় গল্প-উপন্যাসের চরিত্ররা নির্বিকার থাকে। একটা হিন্দি ছবিতে দেখেছিলাম, নায়ক জানতে পেরেছে ক্যানসার হয়েছে। অল্প কিছুদিন বাঁচবে। জানবার পর থেকে তার ধেই ধেই নৃত্য আরও বেড়ে গেল। কথায় কথায় গান। কথায় কথায় হাসি।

বাস্তব কখনোই সেরকম নয়। বাস্তবের অসীম সাহসী মানুষও মৃত্যুর মুখোমুখি হতে পারে না। মৃত্যুকে সহজভাবে গ্রহণ করা তো অনেক দূরের ব্যাপার—

আমরা বেঁচে থাকতে চাই। শুধুই বেঁচে থাকতে চাই। যখন শেষ সময় উপস্থিত হয় তখনো বলি, দাও দাও। আর একটি মুহূর্ত দাও। দয়া করো।

'গলিত স্থবির ব্যাঙ আরও দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইশারায় অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।'

[আট বছর আগে একদিন]

যে জীবনের জন্যে আমাদের এত মোহ, এত ভালোবাসা, সেই জীবনটা যে কী তা-ই কি আমরা জানি ? নিঃশ্বাস নেওয়া, খাওয়া এবং ঘুমানো ? নাকি তার বাইরেও কিছু ?

তত্ত্বকথায় না গিয়ে আগের জায়গায় ফিরে যাই। যে ভদ্রলোকের কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, তাঁর কাছে যাওয়া যাক। ভদ্রলোক শিক্ষকতা করেন। প্রাইভেট কলেজে ইংরেজি সাহিত্য পড়ান। তাঁর সারা জীবনই কষ্টে কষ্টে গেছে। শেষ সময়ে একটু সুখের মুখ দেখলেন। এক ছেলে সরকারি কলেজে শিক্ষকতার কাজ পেল। আরেক ছেলে ব্যবসাতে ভালো টাকা পেতে লাগল। একমাত্র মেয়েটি মেডিক্যাল কলেজে ফোর্থ ইয়ারে আছে। এমন সুখের সময় সব ছেড়ে ছুড়ে চলে যাওয়ার চিন্তাটাই তো অসহনীয়।

তারচেয়েও বড় কথা, তাঁর যাত্রা এমন এক ভুবনের দিকে যে ভুবন সম্পর্কে কিছুই জানা নেই। সঙ্গী-সাথিও কেউ নেই যে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, ভদ্রলোক মৃত্যুর প্রস্তুতিপর্ব শুরু করলেন অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে। এরকম ভঙ্গি যে থাকা সম্ভব তা-ই আমি জানতাম না।

তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। ধরেই নিয়েছি, মৃত্যুভয়ে ভীত একজন মানুষকে দেখব, যিনি ডুবন্ত মানুষের মতো হাতের কাছে যা দেখছেন তা-ই ধরার চেষ্টা করছেন। যা ধরতে যাচ্ছেন তাও ফসকে ফসকে যাচ্ছে।

গিয়ে দেখি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। ভদ্রলোক শুয়ে আছেন ঠিকই, কিন্তু মুখ হাসি হাসি। তাঁর হাতে কী-একটা ম্যাগাজিন। তিনি আমাকে দেখে হই হই করে উঠলেন।

আরে আরে, মিসির আলি চলে এসেছে!

আমি বললাম, কেমন আছেন ?

খুবই খারাপ আছি। টাইমলি এসেছ। আর কিছুদিন পরে এলে দেখা হতো না। ডাক্তার বলে দিয়েছে, আর বড়জোর এক মাস।

আপনাকে দেখে কিন্তু ভালো লাগছে।

ভালো লাগারই তো কথা। চেহারা তো কোনোদিন খারাপ ছিল না। হা হা হা।

আমি রীতিমতো চকচকিয়ে গেলাম। কী নিয়ে আলাপ করব তাও বুঝতে পারছি না। মৃত্যুকে শিয়রে নিয়ে যিনি বসে আছেন তাঁর সঙ্গে নিশ্চয়ই নাটক নিয়ে কথা বলা যায় না।

আমি বললাম, এখন চিকিৎসা কী হচ্ছে ?

তিনি গলার স্বর নামিয়ে বললেন, সবরকম চিকিৎসা চলছে। আধিভৌতিক চিকিৎসাই বেশি চলছে। বর্তমানে একজন জ্বিন-ডাক্তার আমার চিকিৎসা করছেন।

কে চিকিৎসা করছেন ?

জ্বিন। জ্বিনদের মধ্যেও ডাক্তার-কবিরাজ আছে। তাঁদেরই একজন।

বলেন কী!

যে যেখানে যা পাচ্ছে ধরে নিয়ে আসছে। কবিরাজ, পানিপড়া, মন্ত্র-তন্ত্র সব চলছে। একজন বালক-পীরের সন্ধান পাওয়া গেছে। বয়স নয় বছর। টাঙ্গাইলে থাকে। সে তেলপড়া দিয়েছে। সেই তেলপড়াও পেটে মালিশ করলাম।

কোনো লাভ হচ্ছে কি ?

লাভ হবে কোত্থেকে ? অনেকের ভালো ব্যবসা হচ্ছে। তবে আমি আপত্তি করছি না। যে যা করতে বলছে, করছি। অনেকে আবার বোকার মতো জিজ্ঞেস করে, কী খেতে মন চায় ? আমি রাগ করতে গিয়েও রাগ করি না। কী হবে রাগ করে ? আমি খাবারের নাম বলি—যা খুব সহজে পাওয়া যায় না, আবার একেবারে দুষ্প্রাপ্যও নয়। যেমন একজনকে বললাম, চালতার আচার খেতে ইচ্ছে করছে। সে অনেক খুঁজে পেতে এক হরলিক্সের টিনভর্তি চালতার আচার নিয়ে এল এবং এই আচার খুঁজে বের করতে তার যে কী কষ্ট হয়েছে সেটা সে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে বলল।

ভদ্রলোক কথা বলতে বলতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। আমি বললাম, আপনি আর কথা বলবেন না, বিশ্রাম করুন। আমি আবার আসব।

তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বললেন, এসো। এখন কথা বলতে এবং কথা শুনতে ভালো লাগে। আমি ইন্টারেস্টিং কিছু শুনতে চাই। কেউ ইন্টারেস্টিং কিছু বলতে পারে না। সবাই আমার কাছে এখন আসে তাদের সবচেয়ে বোরিং গল্পটা নিয়ে।

আমি চলে এলাম। চার-পাঁচ দিন পর তাঁর ছেলে আমাকে এসে বলল, বাবার শরীর খুব খারাপ করেছে। আপনাকে শেষ দেখা দেখতে চায়।

আমি তৎক্ষণাৎ গেলাম। ভদ্রলোকের মুখ এখনো হাসি হাসি। আমি বললাম, কেমন আছেন ?

তিনি উত্তর দিলেন না। সম্ভবত এই প্রশ্নের উত্তর দিতে তাঁর ইচ্ছে করছে না। আগেরবার আমার সঙ্গে আধশোয়া হয়ে গল্প করছিলেন—এবার শুয়েই রইলেন।

ছেলেকে বললেন পাশ ফিরিয়ে দিতে। ছেলে পাশ ফিরিয়ে দিল। তিনি ক্ষীণ গলায় বললেন, যাত্রার সব আয়োজন সম্পন্ন করেছি। একটা ইচ্ছে ছিল—আমার স্কুলের সব ছাত্রকে এক বেলা দাওয়াত করে খাওয়াব। সে ইচ্ছেও পূর্ণ হচ্ছে। শনিবার দুপুরে এরা খাবে।

বাহ, ভালো তো!

তুমি এসো শনিবারে। তোমাকে দাওয়াত করছি না। দেখার জন্যে আসবে। ওইদিন শুধু বাচ্চাদের দাওয়াত।

জি, আমি আসব।

তিনি অল্প খানিকক্ষণ কথা বলার পরিশ্রমেই হাঁপাতে লাগলেন। আমি বসে রইলাম। বিস্তর লোকজন আসছে-যাচ্ছে। অধিকাংশই কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলছে। তিনি সবার সঙ্গেই সহজভাবে একটা-দুইটা করে কথা বললেন। আমাকে নিচু গলায় বললেন, আল্লাহপাক নিজেই মনে হয় মানুষকে মৃত্যুর জন্যে তৈরি করেন। এখন আর মানুষের সঙ্গ আমার ভালো লাগে না, অথচ কয়েক দিন আগেই অন্য ব্যাপার ছিল।

মৃত্যুর জন্যে আপনি তাহলে তৈরি?

হ্যাঁ।

ভয় লাগছে না?

লাগছে। আবার এক ধরনের কৌতূহলও হচ্ছে। এই প্রথমবার আমি এমন একটা জিনিস জানব যা তোমরা কেউ-ই জান না। মৃত্যু কী সেটা জানা যাবে। ঠিক না?

জি ঠিক।

একটা মজার ব্যাপার কী লক্ষ করেছ—জন্ম-সময়ের স্মৃতি মানুষ অন্যকে বলতে পারে না, আবার মৃত্যুর কথাও বলতে পারে না। জন্ম-মৃত্যু দুটা স্মৃতিই এমন যা অন্যকে দেওয়া যায় না। দুটোই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত স্মৃতি।

ঠিকই বলেছেন।

অসুস্থ মানুষের সামনে বসে চা খাওয়া যায় না। আমাকে খেতে হলো। তিনি চা না খাইয়ে ছাড়ছেন না। চলে আসবার সময় হঠাৎ বললেন, তুমি জিজ্ঞেস করছিলে—ভয় লাগছে কি না। হ্যাঁ লাগছে, প্রচণ্ড লাগছে। তবে এক ধরনের ভরসাও পাচ্ছি।

ভরসা পাচ্ছেন কেন?

ভরসা পাচ্ছি, কারণ পবিত্র কোরানশরিফে কয়েকটা অসাধারণ আয়াত আছে। ওই আয়াতগুলো থেকে ভরসা পাচ্ছি। তুমি তো লেখালেখি করো—কোনো একফাঁকে এই আয়ত ক'টা ঢুকিয়ে দিয়ো। এতে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষেরা ভরসা পাবে।

আমি বললাম, আয়াত ক'টি বলুন আমি লিখে নিচ্ছি।

> সুরা আল-ওয়াকিয়া, আয়াত ৮৪ ও ৮৫—
>
> একজন মানুষ যখন মারা যায়—
>
> তোমরা তখন তাকে ঘিরে বসে থাকো।
>
> কিন্তু তোমরা জানো না, তোমরা ওই মৃত্যুপথযাত্রীর যতটা কাছে বসে থাকো আমি তারচেয়েও অনেক কাছে থাকি।

ভদ্রলোক শান্তস্বরে বললেন, মৃত্যুর সময় পরম করুণাময় যদি আমার পাশে থাকেন, তাহলে আর ভয় কী?

আমার বাবার জুতা

বিজয় দিবসের কত সুন্দর স্মৃতি মানুষের আছে। সেসব স্মৃতিকথা অন্যকে শোনাতে ভালো লাগে। প্রেমিকার প্রথম চিঠি পাওয়ার গল্প বলার সময় যেমন রোমাঞ্চকর অনুভূতি হয়, বিজয় দিবসের গল্প বলার সময়ও তা-ই হয়। আমার বন্ধু *দৈনিক বাংলার* সালেহ চৌধুরীকে দেখেছি বিজয় দিবসের স্মৃতিকথা বলার সময় তাঁর চোখে পানি এসে পড়ে। যদিও তেমন কিছু উল্লেখ করার মতো স্মৃতি নয়। তিনি তাঁর মুক্তিযোদ্ধা দলবল নিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিলেন। হঠাৎ শুনলেন দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। যুদ্ধের অবসান হয়েছে, আর গুলি ছুড়তে হবে না। তিনি রাইফেল ছুড়ে ফেলে মাটিতে গড়াগড়ি করে কাঁদতে শুরু করলেন। এই গল্প বলার সময় কেউ কাঁদতে শুরু করলে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না।

আমার দূরসম্পর্কের এক চাচা বিজয় দিবসের স্মৃতি এভাবে বলেন, খবরটা শোনার পর কানের মধ্যে 'তবদা' লেগে গেল। আর কিছুই কান দিয়ে ঢুকে না। আমি দেখছি সবার ঠোঁট নড়ে, কিন্তু কিছু শুনি না। আজব অবস্থা!

১৬ ডিসেম্বর কাছাকাছি এলেই পত্রিকাওয়ালারা বিজয় দিবসের স্মৃতিকথা ছাপানোর জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁরা কখনোই ভাবেন না, সেদিনের কথা যথাযথভাবে বলা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। সেদিন আমরা সবাই ঘোরের মধ্যে ছিলাম। ঘোরের স্মৃতি হলো এলোমেলো স্মৃতি। ঘোরের কারণে তুচ্ছ জিনিসকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। মস্তিষ্ক খুব যত্ন করে তার মেমোরি সেলে তুচ্ছ জিনিসগুলো রেখে দেয়। আবার অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস সে অদরকারি মনে করে ফেলে দেয়।

একজন মাতালকে নেশা কেটে যাওয়ার পর যদি জিজ্ঞেস করা হয়, নেশা করার ওই রাতে তুমি মদ্যপান ছাড়া আর কী করেছিলে? সে পরিষ্কার কিছু বলতে পারবে না। বলতে পারার কোনো কারণ নেই। বিজয় দিবসে আমরা সবাই এক প্রচণ্ড নেশার মধ্যে ছিলাম। কাজেই, হে পত্রিকা সম্পাদক, আপনি কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। জিজ্ঞেস করলেই আমরা উল্টাপাল্টা কথা বলব। আপনার ধারণা হবে আমরা মিথ্যা কথা বলছি। কিন্তু আমরা কেউ মিথ্যা বলছি না। দেশের স্বাধীনতা নিয়ে কি আর মিথ্যা গল্প করা যায়?

আজ আমি বিজয় দিবসের স্মৃতির গল্প করব না। আমি বরং আমার বাবাকে নিয়ে একটি গল্প বলি। এই মহান ও পবিত্র দিনে গল্পটি বলা যেতে পারে।

আমার বাবার এক জোড়াই জুতা ছিল। লাল রঙের চামড়ার জুতা। মাল্টিপারপাস জুতা। সাধারণভাবেও পরতেন, আবার তাঁর পুলিশের ইউনিফর্মের সঙ্গেও পরতেন। জুতা জোড়ার সঙ্গে আমরা খুব পরিচিত, কারণ আমাদের প্রায়ই তাঁর জুতা কালি করতে হতো। কাজটা আমাদের খুব পছন্দের ছিল। জুতার কালির গন্ধটা খুব মজা লাগত। আবার ব্রাশ ঘষতে ঘষতে জুতা যখন ঝকঝকে হয়ে উঠত, তখন দেখতে ভালো লাগত। সবচেয়ে বড় কথা—ঝকঝকে জুতা দেখে বাবা বলতেন, আরে বাপ রে, একেবারে আয়না বানিয়ে ফেলেছে। এই বাক্যটি শুনতেও বড় ভালো লাগত।

১৯৭১ সালের ৫ মে আমার বাবা তাঁর লাল জুতা পরে বরিশালের গোয়ারেখো গ্রাম থেকে বের হলেন। সেদিন জুতা জোড়া কালি করে দিল আমার ছোট বোন। বাবা যথারীতি বললেন, 'আরে বাপ রে, একেবারে আয়না বানিয়ে ফেলেছিস!' সেই তাঁর জুতা পরে শেষ বের হয়ে যাওয়া।

সন্ধ্যার সময় খবর এল—বলেশ্বর নদীর তীরে দাঁড় করিয়ে মিলিটারিরা তাঁকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। মানুষকে যে এত সহজে মেরে ফেলা যায়, তা আমার মা তখনো জানতেন না। তিনি খবরটা বিশ্বাস করলেন না। তিনি আমাদের ডেকে বললেন, তোরা এই লোকগুলোর কথা বিশ্বাস করিস না। তোর বাবা সারা জীবনে কোনো পাপ করে নি। এ রকম মৃত্যু হতে পারে না। তোর বাবা অবশ্যই বেঁচে আছে। যেখানেই থাকুন তিনি যেন সুস্থ থাকেন, এই দোয়া করি। আমি জানি তোর বাবার সঙ্গে তোদের আবার দেখা হবে অবশ্যই।

একজনের বিশ্বাস অন্যের মধ্যে সংক্রমিত হয়। আমরা সবাই মা'র কথা বিশ্বাস করলাম। এর মধ্যে মা এক রাতে স্বপ্নেও দেখলেন, মিলিটারিরা বাবাকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে সেখানেই এক জেলে আটকে রেখেছে। বাবা স্বপ্নে মাকে বললেন, 'দেশ স্বাধীন হলেই এরা আমাকে ছেড়ে দেবে। তখন তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। এই ক'দিন একটু কষ্ট করে থাকো।'

মা খাওয়াদাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিছুই খেতে পারতেন না। এই স্বপ্নের পর আবার অল্পস্বল্প খেতে শুরু করলেন। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম স্বাধীনতার দিনটির জন্যে। আমরাও মা'র মতোই ধরে নিয়েছিলাম, দেশ স্বাধীন হলেই বাবাকে পাওয়া যাবে। মা'র প্রতি আমাদের এই অবিচল বিশ্বাসের কারণও আছে। আমার মা কখনোই তাঁর ছেলেমেয়েকে কোনো ভুল আশ্বাস দেন নি।

আমরা তখন গ্রামে পালিয়ে আছি। মে মাস প্রায় শেষ হতে চলেছে। ঘোর বর্ষা। দিনের পর দিন একনাগাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে। তখন অদ্ভুত একটা খবর পাওয়া গেল। এক লোক নাকি বলেশ্বর নদী দিয়ে ভেসে যাওয়া একটা লাশ তুলে কবর দিয়েছে। তার ধারণা, এটা পিরোজপুরের পুলিশপ্রধান ফয়জুর রহমান আহমেদের লাশ। সে লাশটা কবর দিয়েছে, তবে প্রমাণের জন্যে লাশের পা থেকে জুতা জোড়া খুলে রেখেছে। এই জুতা জোড়া সে আমাদের হাতে তুলে দিতে চায়। আমার মা বললেন, অসম্ভব। এটা হতেই পারে না। নিশ্চয়ই অন্য কারও জুতা। তবু পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্যে আমাকে জুতা আনতে শহরে পাঠালেন। আমাকে পাঠানোর কারণ হলো, আমার মা'র ধারণা, আমি খুব ভাগ্যবান ছেলে। আমি কখনো অমঙ্গলের খবর আনব না।

মিলিটারিতে তখন পিরোজপুর গিজগিজ করছে। এই অবস্থায় কোনো যুবক ছেলের শহরে ঢোকা মানে জীবন হাতে নিয়ে ঢোকা। তার ওপর শুনেছি, মিলিটারিরা আমাকে এবং আমার ছোট ভাইকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আমি শহরে গেলাম লুঙ্গি, পাঞ্জাবি এবং টুপি মাথায় দিয়ে, যেন কেউ চিনতে না পারে। ওই লোককে খুঁজে বের করলাম। আমাকে জুতা জোড়া দেওয়া হলো। হ্যাঁ, আমার বাবারই জুতা। ভুল হওয়ার কোনোই কারণ নেই। জুতা নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরলাম। আমার মা জুতা দেখলেন। তিনিও বুঝলেন এটা কার জুতা, তারপরও বিশ্বাস করলেন না। এরকম জুতা তো কত মানুষেরই থাকতে পারে। তিনি আমাদের বললেন, জুতা দেখে তোরা মন খারাপ করিস না। এটা মোটেই কোনো জোরালো প্রমাণ না। জুতা জোড়া কাগজে মুড়ে এক কোনায় রেখে দেওয়া হলো।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পর মা ঢাকা থেকে পিরোজপুর গেলেন। নদীর পাড়ে যেখানে বাবাকে কবর দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি করা হয়েছে, সেই জায়গা নিজে উপস্থিত থেকে খোঁড়ালেন। কবর থেকে লাশ তোলা হলো। শরীর পচে-গলে গেছে, কিন্তু নাইলনের মোজা অবিকৃত। মা পায়ের মোজা, দাঁত, মাথার চুল দেখে বাবাকে শনাক্ত করলেন। দীর্ঘ ছ' মাস পর তিনি স্বীকার করলেন, তাঁর স্বামী বেঁচে নেই।

তিনি ঢাকায় ফিরে এলেন। আমাদের যে এত দিন মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছেন, তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। আমার সবচেয়ে ছোট বোনটি অসুস্থ। সে কথা বলতে পারে না, কানেও শোনে না। মা আমার ছোট ভাইকে বললেন তাকে যেন বাবার মৃত্যুর ব্যাপারটি বুঝিয়ে বলা হয়।

সন্ধ্যাবেলা মা কাগজের মোড়ক থেকে জুতা জোড়া বের করলেন। অনেক সময় নিয়ে পরিষ্কার করলেন। লাল কালি কিনে এনে জুতা কালি করা হলো। আমরা দেখলাম, তাঁর বিছানায় বালিশের পাশে জুতা জোড়া রাখা হয়েছে। সেই রাতে তিনি বাবার জুতা জোড়া জড়িয়ে ধরে বিছানায় শুতে গেলেন।

আজকের এই মহা আনন্দের দিনে আমি আপনাদের আমার একটি ব্যক্তিগত কষ্টের গল্প বললাম। আমার এই কষ্ট যেন আপনাদের আনন্দকে কোনোভাবেই ছোট না করে। আজকের দিনে কষ্টের কোনো স্থান নেই। আমার বাবা এই দেশকে ভালোবেসেছিলেন। আমিও ভালোবাসি। অবশ্যই আমার ছেলেমেয়েরাও বাসবে। আজকের দিনে এই ভালোবাসাই সত্য, আর সব মিথ্যা।

প্রতিবছর বিজয় দিবস আসে, আমি নিজের হাতে বাসায় একটা পতাকা টানাই। পতাকাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে বড় ভালো লাগে। আমার কী সৌভাগ্য, স্বাধীন দেশের পতাকা নিজের হাতে উড়াচ্ছি।

আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তব,
ফুরায়ে গেলে আবার ভরেছ জীবন নব নব।

হোটেল আহমেদিয়া

আমি একবার একটা ভাতের হোটেল দিয়েছিলাম। নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে হোটেলের নাম—'আহমেদিয়া হোটেল'। আসুন, আপনাদের সেই হোটেলের গল্প বলি।

১৯৭১ সনের কথা। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়। রোজার মাস। থাকি মহসিন হলে, ৫৬৪ নম্বর রুমে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো তখন ছাত্রদের জন্যে নিরাপদ বলে ভাবা হতো। কারণ যারা এই সময়ে হলে থাকবে তারা অবশ্যই পাকিস্তান অনুরাগী। হলে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করছে। এরা সবাই শান্ত এবং সুবোধ ছেলে। মুক্তিবাহিনীতে না গিয়ে পড়াশোনা করছে। আমার তখন কোথাও থাকার জায়গা নেই। নানার বাড়ি মোহনগঞ্জে অনেক দিন লুকিয়ে ছিলাম। আর থাকা যাচ্ছে না। আমার নানাজান দীর্ঘদিনের মুসলিম লীগ কর্মী। তখন শান্তি কমিটির সভাপতি হয়েছেন। নানাজানের শান্তি কমিটিতে যোগ দেওয়ার ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন বোধ করছি। আমি আমার নানাজনের জন্যে সাফাই গাইছি না। আমার সাফাইয়ের তাঁর প্রয়োজন নেই। তবু সুযোগ যখন পাওয়া গেল বলি। চারদিকে তখন ভয়ংকর দুঃসময়। আমার বাবাকে পাকিস্তানি মিলিটারি গুলি করে হত্যা করেছে। নানাজান আমাদের সুদূর বরিশালের গ্রাম থেকে উদ্ধার করে নিজের কাছে নিয়ে এসেছেন। তা-ও এক দফায় পারেন নি। কাজটি করতে হয়েছে দুবারে। তাঁর অনুপস্থিতিতেই তাঁকে শান্তি কমিটির সভাপতি করা হলো। তিনি না বলতে পারলেন না। না বলা মানেই আমাদের দু' ভাইয়ের জীবন সংশয়। আমাদের আশ্রয় সুরক্ষিত করার জন্যেই মিলিটারিদের সঙ্গে ভাব রাখা তিনি প্রয়োজন মনে করেছিলেন। তার পরেও আমার মা এবং আমার মামারা নানাজানের এই ব্যাপারটি সমর্থন করতে পারেন নি। যদিও নানাজানকে পরামর্শ দিতে কেউ এগিয়ে আসেন নি। সেই সাহস তাঁদের ছিল না। তাঁরা নিজেদের সমর্পণ করেছিলেন নিয়তির হাতে। শান্তি কমিটিতে থাকার কারণে মিলিটারিদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কত মানুষের জীবন তিনি রক্ষা করেছেন সেই ইতিহাস আমি জানি এবং যাঁরা আজ বেঁচে আছেন তাঁরা জানেন। গুলির মুখ থেকে নানাজানের কারণে ফিরে আসা কিছু মানুষই পরবর্তী সময়ে তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাঁকে মরতে হয় মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে। তাঁর মতো অসাধারণ একজন মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে মারা গেলেন, এই দুঃখ আমার রাখার জায়গা নেই।

মিলিটারিরা নানাজানকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারে নি। হঠাৎ হঠাৎ অদ্ভুত সময়ে তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হয়। বাড়ি ঘুরে ফিরে দেখে। একদিন তারা আমাদের দেখে ফেলল। ভুরু কুঁচকে বলল, এরা কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ? দেখে তো সে রকমই মনে হয়। এরা বিশ্ববিদ্যালয়ে না গিয়ে ঘরে বসে আছে কেন ? নানাজান কোনো সদুত্তর দিতে পারলেন না। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, ঢাকায় পাঠাতে ভরসা পাচ্ছি না বলে আটকে রেখেছি। তবে শিগগিরই পাঠাব।

আমি নিজেও এক জায়গায় বসে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে একটি চিঠি পাঠিয়েছি ৫ নম্বর সেক্টরের সালেহ চৌধুরীকে (*দৈনিক বাংলার* সালেহ চৌধুরী)। তিনি তখন ভাটি অঞ্চলে প্রবল প্রতাপে মুক্তিবাহিনী নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তিনি আমার চিঠির জবাব দিলেন না। এটা অবশ্যি আমার জন্যে ভালোই হয়েছে। মনের দিক থেকে আমি চাচ্ছি না জবাব আসুক। জবাব এলেই মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে হবে, এবং অবধারিতভাবে মিলিটারির গুলি খেয়ে মরতে হবে। এত তাড়াতাড়ি মৃত্যুকে স্বীকার করে নেওয়ার মতো মানসিক প্রস্তুতি আমার ছিল না। আমি ভীতু হয়ে জন্মেছি।

কাজেই চলে এলাম ঢাকায়, উঠলাম হলে। বলা চলে, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। আমার অতি প্রিয়জন আনিস ভাইও দেখি হলেই আছেন। আমার পাশের ঘরে থাকেন। ফিজিক্সে পড়াশোনা বাদ দিয়ে তিনি তখন সিনেমা নিয়ে পড়াশোনা করেন, একটা চিত্রনাট্যও তৈরি করেছেন। তাঁর একটা দামি ট্রানজিস্টার রেডিও আছে। সেই ট্রানজিস্টার রেডিওতে স্বাধীন বাংলা বেতার, বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা শোনা হয়। রাত যখন গভীর আমরা চলে যাই ছ'তলায়। সেখানে দুটি ছেলে আছে (দু' ভাই)। তারা প্ল্যানচেটের বিষয়ে নাকি বিশেষজ্ঞ। তারা প্ল্যানচেটে ভূত নামায়। ভূতের মারফতে অনেক তথ্য আসে। দেশি ভূতদের মধ্যে সবাই আবার ভুবনবিখ্যাত। তাদের ভূত না বলে আত্মা বলা উচিত। নয়তো তাদের অসম্মান হবে। যেমন—রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, শেরে বাংলা। এঁদের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ খুবই মিশুক প্রকৃতির, ডাকলেই চলে আসেন। দেশ কবে স্বাধীন হবে জানতে চাইলে বলেন, ধৈর্য ধরো। ধৈর্য ধরতে শেখো। দু' থেকে তিন বছরের মধ্যেই স্বাধীনতা পাবে।

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনার ওপর আমাদের আস্থা কম ছিল বলেই বোধহয় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকেও এক রাতে আনা হয়। তিনি এসেই আমাদের স্টুপিড, ননসেন্স বলে গালাগালি করতে থাকেন।

মোটের ওপর আমাদের সময়টা ভালো কাটে। ভূতবিশেষজ্ঞ দুই ভাই পরকাল, আত্মা, সৃষ্টিকর্তা বিষয়ে নানা জ্ঞান দেয়, শুনতে মন্দ লাগে না। সবচেয়ে বড় কথা—মিলিটারি এসে ধরে নিয়ে মেরে ফেলবে, এই সার্বক্ষণিক ভয়ের হাত

থেকে মুক্তি পেয়েছি, যার আনন্দ কম নয়। কষ্ট একটাই—খাওয়ার কষ্ট। রোজার সময় বলেই সব দোকান বন্ধ। হোটেল তো বন্ধই, চায়ের দোকানও বন্ধ। হলের মেসও বন্ধ। ধর্মীয় কারণে নয়, নিতান্ত বাধ্য হয়েই হলের অনেকেই রোজা রাখছে। সেখানেও বিপদ আছে। বিকেলে ইফতারি কিনতে নিউমার্কেট গিয়ে একজন মিলিশিয়ার বেধড়ক মার খেল। মিলিশিয়ার বক্তব্য, রোজার দিনে এই ছাত্র নাকি ছোলা ভাজা খাচ্ছিল।

আমি নিজে ক্ষুধা সহ্য করতে পারি না। খিদে পেলেই চোখে অন্ধকার দেখি। অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরা প্রথম এবং শেষ রোজা রেখে রোজা বেঁধে ফেলার যে প্রক্রিয়া করে, আমি তা-ও পারি না। প্রথম রোজাটা রাখি; শেষটা রাখি না, সম্ভব হয় না।

আমি মহাবিপদে পড়লাম। দুপুরে চিনি দিয়ে পাউরুটি খাই। খিদে যায় না। সারাক্ষণ খিদে লেগে থাকে। একদিন দোকান থেকে একটা হিটার কিনে আনলাম, টিনের বাটিতে কিছু চাল ফুটিয়ে নিলাম। ডিম ভাজলাম। লবণ কেনা হয় নি। লবণহীন ডিম ভাজা দিয়ে ভাত খেলাম। অমৃতের মতো লাগল। আনিস ভাই এসে আমার সঙ্গে যোগ দিলেন। পরের দিন ভূতবিশেষজ্ঞ দুই ভাই এসে উপস্থিত। তারা জানতে চায়, তাদের কাছে অ্যালুমিনিয়ামের একটা বড় সসপ্যান আছে, আমরা সেটা চাই কি না।

আমি বললাম, অবশ্যই চাই।

তখন দুই ভাই মাথা চুলকে বলল, তারা কি আমার সঙ্গে খেতে পারবে? খরচ যা লাগবে দেবে। তারাও নাকি দুপুরে পাউরুটি খেয়ে আছে।

আমি বললাম, অবশ্যই খেতে পারবে।

চতুর্থ দিনে আমাদের সদস্য সংখ্যা হলো দশ। অতি সস্তায় দুপুরের খাওয়া। ভাত-ডাল এবং ডিম ভাজি। সবাই খুব মজা পেয়ে গেল। আসলে কারোরই তখন কিছু করার নেই। বিশ্ববিদ্যালয় নামে মাত্র খোলা, কেউ সেখানে যায় না। সবাইকে হলে বন্দি থাকতে হয়। বন্দিজীবনে বৈচিত্র্য হলো এই রান্নাবান্না খেলা। আমরা একদিন একটা বড় ফুলস্কেপ কাগজে লিখলাম

আহমেদিয়া ভাতের হোটেল

ভাত এক টাকা। ডাল আট আনা। ডিম এক টাকা।

হোটেলের নিয়মাবলি

১. যাহারা খাদ্য গ্রহণ করিবেন, তাহারা সকাল দশটার মধ্যে নাম এন্ট্রি করাইবেন।

২. খাওয়ার সময় ভাত নরম না শক্ত এই বিষয়ে কোনো মতামত দিতে পারিবেন না।

ফুলস্কেপ কাগজটি আমার ঘরের দরজায় আঠা দিয়ে সেঁটে দেওয়া হলো।

এক রোববারে ইমপ্রুভড ডায়েটের ব্যবস্থা হলো। ভুনা খিচুড়ি এবং ডিম ভাজা। ভুনা খিচুড়ি কী করে রাঁধতে হয় তখন জানি না। ভূতবিশেষজ্ঞ দুই ভাই বলল, তারা জানে, খিচুড়ি তারা রাঁধবে। এই বিষয়ে কাউকে কোনো চিন্তা করতে হবে না। শুধু খিচুড়ি না, তারা নাকি কলিজিও রাঁধবে।

সকাল থেকে রান্নার আয়োজন শুরু হলো। সদস্যদের আগ্রহের সীমা নেই। রান্না শেষ হতে হতে দু'টো বেজে গেল। আমরা খেতে বসব, তখন হঠাৎ একজন ছুটে এসে বলল, মিলিটারি হল ঘেরাও করে ফেলেছে। আমরা হতভম্ব। হল কেন ঘেরাও করবে ? হল তো খুব নিরাপদ হওয়ার কথা। দেখতে দেখতে হলে মিলিটারি ঢুকে পড়ল। ভেড়ার পালের মতো আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল নিচে। সবাইকে লাইন বেঁধে দাঁড়া করাল। আমরা আতংকে জমে গেলাম। কী হচ্ছে এসব ? সব মিলে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশজন ছাত্র। হলের কিছু কর্মচারী। হলের সামনে সাক্ষাৎ মৃত্যুদূতের মতো একটি মিলিটারি জিপ, একটি ট্রাক এবং মুড়ির টিন জাতীয় গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। মুড়ির টিন গাড়িটির দরজা-জানালা সব বন্ধ। তবে ভেতরে লোক আছে। কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। গাড়ির একটি ছোট্ট জানালা আধখোলা। জানালার ওপাশে কেউ-একজন বসে আছে, বাইরে থেকে আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি না। জানালার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় গাড়ির ভেতরে বসা কেউ-একজন হঠাৎ বলে বসে—একে আলাদা করো। তাকে আলাদা করা হয়। এইভাবে চারজনকে আলাদা করা হলো। তিনজন ছাত্র। একজন হলের কর্মচারী। তিনজন ছাত্রের মধ্যে একজন আমি।

কী সর্বনাশ! এখন কী করি। মিলিটারি ধরে নিয়ে যাওয়ার নাম তো নিশ্চিত মৃত্যু। এত তাড়াতাড়ি মরে যাব ?

আমাদের খোলা ট্রাকে তোলা হলো। মিলিটারিরা আমাদের নিয়ে রওনা হলো। আমি হলের দিকে তাকালাম, আমার বন্ধুদের দিকে তাকালাম। আমি জানি—এই হল, বন্ধুদের প্রিয় মুখ আমি আর কখনো দেখতে পাব না।

আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো আণবিক শক্তি কমিশন ভবনে। ওই ভবনটি তখন মিলিটারিদের অস্থায়ী ঘাঁটির একটি। সেখানে পৌঁছে জানতে পারলাম, আমাদের সবার বিরুদ্ধেই সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আছে, আমরা দেশদ্রোহী। ঢাকায় গেরিলা বাহিনীর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ আছে। কী ভয়ানক অবস্থা! সেখান থেকে জিপে করে আমাদের পাঠানো হলো বন্দিশিবিরে। বিরাট একটা হলঘরের

মতো জায়গায় আমাদের রাখা হলো। আরও অনেকেই সেখানে আছেন। সবার চোখেই অদ্ভুত এক ধরনের ছায়া। সম্ভবত মৃত্যুর ছায়া। তারা তাকাচ্ছে, কিন্তু মনে হচ্ছে কিছু দেখছে না। মানুষের প্রধান যে বৈশিষ্ট্য—কৌতূহল—সেই কৌতূহলের কিছুই তাদের চোখে নেই। এখান থেকে একজন একজন করে নিয়ে যাচ্ছে পাশের ঘরে। তারপরই বীভৎস চিৎকার শুনতে পাচ্ছি। সে চিৎকার মানুষের চিৎকার নয়, পশুর চিৎকার। একসময় চিৎকারের শব্দ কমে আসে। শুধু গোঙানির শব্দ কানে আসে। সেই শব্দও যখন কমে আসে, তখন শুধু ক্লান্ত কাতরধ্বনি কানে আসে—পানি, পানি...।

আমি আমার পাশে বসা এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কি সবাইকে এ রকম শাস্তি দেয়?

ভদ্রলোক আমার প্রশ্নে বিস্মিত হয়ে তাকালেন, জবাব দিলেন না। সম্ভবত এ রকম ছেলেমানুষী প্রশ্নের জবাব দিয়ে তিনি সময় নষ্ট করতে চান না।

অনেককেই দেখলাম নামাজ পড়ছেন। নামাজের সময় নয়, তবু পড়ছেন। নিশ্চয়ই নফল নামাজ। কী ভয়াবহ আতংক তাদের চোখে-মুখে!

জিজ্ঞাসাবাদ এবং শাস্তির জন্যে আমার ডাক পড়ল রাত এগারোটার দিকে। ছোট্ট একটা ঘরে নিয়ে আমাকে ঢোকানো হলো। সেই ঘরের মেঝেতে তখন একজন শুয়ে আছে। লোকটা উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। শুধু মৃদু গোঙানির শব্দ আসছে। মৃত্যুর আগে মানুষ হয়তো এরকম শব্দ করে। মানুষটার গায়ে একটি গেঞ্জি—গেঞ্জিতে চাপ চাপ রক্ত। এ ছাড়াও ঘরে আরও দুজন মানুষ আছে। একজনের মুখে শ্বেতীর দাগ। সে গোশত এবং পরোটা খাচ্ছে। অন্য একজনের হাতে এক কাপ চা। সে পিরিচে ঢেলে চা খাচ্ছে। দুজনের মুখই হাসি হাসি। মেঝেতে একজন মানুষ মারা যাচ্ছে, তা নিয়ে তাদের কোনো রকম মাথাব্যথা নেই। মৃত্যু তখন এতই সহজ। আমি ঘরে ঢুকতেই মুখে শ্বেতীর দাগওয়ালা মানুষটা বলল (উর্দুতে), আমি খাওয়া শেষ করে নেই, তারপর তোমার সঙ্গে খোশগল্প করব। আপাতত বিশ্রাম করো। হা হা হা।

লোকটার খাওয়া দেখে এই প্রথম মনে হলো, আজ সারা দিন আমি কিছু খাই নি। হোটেল আহমেদিয়ায় আজ ইমপ্রুভড ডায়েট রান্না করা হয়েছে। আমার বন্ধুরা কি কিছু খেতে পেয়েছে?

না, ওই দিন আমার বন্ধুরা কিছু খেতে পারে নি। আমাদের ধরে নিয়ে যাওয়ার পর তারা সবাই এসে বসল আমার রুমে। আনিস সাবেত বললেন, হুমায়ূনকে বাদ দিয়ে এই খাবার আমি খেতে পারব না, তোমরা খাও। অন্যরাও রাজি হলো

না। ঠিক করা হলো, যদি আমি জীবিত অবস্থায় ফিরে আসি তাহলে আবারও ইমপ্রুভড ডায়েট রান্না হবে। হইচই করে খাওয়া হবে। আনিস সাবেত আমার দরজার সামনে থেকে আহমেদিয়া হোটেলের সাইনবোর্ড তুলে ফেললেন।

পরম করুণাময়ের অসীম কৃপায় আমি জীবিত অবস্থায় ফিরে আসি। বন্ধুবান্ধবরা তখন নানান দিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে।

আমি ফিরে আসি জনশূন্য ফাঁকা হলে। জীবিত ফিরে আসার উত্তেজনায় দু' রাত আমি একফোঁটা ঘুমুতে পারি নি। বারবার মনে হতো, এটা হয়তো স্বপ্ন। স্বপ্ন কেটে যাবে, আমি দেখব মুখে শ্বেতী দাগওয়ালা মানুষটা বলছে, একে নিয়ে যাও, মেরে ফেলো।

দেখতে দেখতে কুড়ি বছর পার হয়ে গেল। আনিস সাবেত মারা গেল ক্যানসারে। বন্ধুবান্ধবরা আজ কে কোথায় জানিও না। মাঝে মাঝে হলের সামনের রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় মনে হয়, আবার সবাইকে খবর দেওয়া যায় না? আবার কি হিটার জ্বালিয়ে ভুনাখিচুড়ি রান্না করে সবাইকে নিয়ে খাওয়া যায় না? খেতে খেতে আমরা পুরোনো দিনের গল্প করব। যে দুঃসময় পার হয়ে এসেছি সেই দুঃসময়ের কথা ভেবে ব্যথিত হব।

হারিয়ে যাওয়া বন্ধুদের প্রায়ই দেখতে ইচ্ছা করে। হঠাৎ হঠাৎ এক-আধজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। খানিক আগে একজনের সঙ্গে দেখা হলো। সে তার ছেলেমেয়ে ও স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে করে যাচ্ছিল। আমাকে দেখে গাড়ি থামাল। নেমে এসে আনন্দিত গলায় বলল, আরে তুই?

হাত ধরে সে আমাকে টেনে নিয়ে গেল তার ছেলেমেয়ের কাছে। গাঢ় গলায় বলল, পরিচয় করিয়ে দেই। এর নাম হুমায়ূন আহমেদ। আমরা একবার একটা হোটেল দিয়েছিলাম—আহমেদিয়া হোটেল। হুমায়ূন ছিল সেই হোটেলের বাবুর্চি।

বলতে বলতে তার চোখে পানি এসে গেল। সে কোটের পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছতে থাকল। তার ছেলেমেয়েরা বাবার এই কাণ্ডের কোনো অর্থ বুঝতে পারল না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। আজকালকার ছেলেমেয়ের কাছে আমাদের চোখের এই অশ্রুর কারণ আমরা কোনোদিনও স্পষ্ট করতে পারব না। একাত্তরের স্মৃতির যে বেদনা আমরা হৃদয়ে লালন করি, এরা তার গভীরতা কোনোদিনই বুঝবে না। বোঝার প্রয়োজনও তেমন নেই। এরা সুখে থাকুক। কোনোদিনও যেন আমাদের মতো দুঃসময়ের ভেতর দিয়ে তাদের যেতে না হয়। এরা যেন থাকে দুধে-ভাতে।

—